পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

অসমিয়া গদ্যের বিবর্তন

নগেন শইকীয়া

[বরণীয় ও স্মরণীয় পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ আর ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের স্মৃতিরক্ষার্থে গঠিত রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন থেকে প্রতি বছর দুটি বক্তৃতার আয়োজনের কথা জানতে পেরে আমি যথার্থই আনন্দিত হয়েছি। এই ফাউন্ডেশন পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক সপ্তম বক্তৃতা প্রদান করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করায় আমি স্বভাবতই বিস্মিত হয়েছি এবং সংকোচ বোধ করছি। এর কারণ হল, পণ্ডিতের স্মৃতিতে আয়োজিত পণ্ডিতের সভায় আসন গ্রহণ করার জন্য আমার পাণ্ডিত্যের কোনো প্রকার বাঞ্ছিত যোগ্যতা নেই। তথাপি বক্তৃতাটি যেহেতু অসমিয়া গদ্যের বিবর্তন সম্পর্কে সেজন্য বরেণ্য পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার সুযোগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। আপনাদের অনেকেরই জানা কথাগুলোকে আমি কেবল আমার মতো করে তুলে ধরছি। আপনাদের চোখে কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে আমি নিশ্চয় কৃতজ্ঞচিত্তে সংশোধনের চেষ্টা করব। এই সুযোগে আমি রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের সভাপতি, সাধারণ সচিব প্রমুখ সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নিষ্ণাত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের স্মৃতিতে মাথা নত করে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।]

॥ এক ॥

প্রস্তাবনা

অসমিয়া ভাষা এবং ভাষার পরিচয়-জ্ঞাপক সাহিত্য-কৃতি

ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের স্তরগুলি হল— বৈদিক আর্যভাষা, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃত ভাষা এবং পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ স্তরের ভাষা। প্রাকৃতের পূর্বমাগধী অপভ্রংশ থেকে সৃষ্ট ভাষাগুলি হল অসমিয়া, বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলি, মগহি এবং ভোজপুরি ভাষা। এই ভাষাগুলির মূল অভিন্ন হলেও বিকাশের পথে প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ভাষাগুলিকে রূপতত্ত্ব এবং ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে পৃথক করেছে। অসমের বিশিষ্ট পণ্ডিত ডিম্বেশ্বর নেওগ প্রমুখ মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী, মাগধী ছাড়াও প্রাচীন কামরূপের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে একটি প্রাকৃত গড়ে ওঠার কথা বলেন। সেইজন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাণীকান্ত কাকতি প্রমুখ পণ্ডিত পূর্বমাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত অপভ্রংশের স্তরটিই এইসব ভাষার উৎস বলে উল্লেখ করেন। অন্য মতের সমর্থকরা 'কামরূপী প্রাকৃত'-এর অস্তিত্বের বিষয়টি অস্বীকার করেননি। সে যা-ই হোক, এই ভাষাগুলির মধ্যে যে জন্মসূত্রের সম্পর্ক আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মূল প্রশ্নটি হল, আমরা যে-ভাষাকে 'অসমিয়া' নামে পরিচয় দিয়েছি সেই ভাষার জন্মের সময় কখন এবং এই ভাষার অসমিয়া নামকরণ কবে থেকে হয়েছে? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, অসমিয়া নামের পূর্বে এই ভাষার নাম কী ছিল?

আর্যভাষা থেকে অসমিয়া ভাষা উদ্ভূত হওয়ার প্রশ্নাতীত তথ্য আর্যভাষী মানুষ, আর্যভাষা এবং আর্যসংস্কৃতি যে এই ভাষার জন্মের কয়েকশো বছর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিবাসিত হয়ে এসেছিল সেই তথ্যের সংকেত দেয়। ঐতিহাসিক কালের পূর্ব থেকেই যে অস্ট্রালীয় এবং কিরাতীয় মূলের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার

উত্তর, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-দক্ষিণ পথে জীবিকার ও বৃত্তির সন্ধানে প্রবেশ করেছিল সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতদ্বৈধ নেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সেজন্য অসমের রক্ত এবং লোকসংস্কৃতি তথা বস্তুগত সংস্কৃতির সম্পর্ক বহুদিন পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল।

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিবাসন করে আল্‌পাইন গোষ্ঠী। এরাই ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আগত প্রথম আর্যভাষী গোষ্ঠী। এর পরে ককেশীয় মূলের আর্যভাষীদের অভিবাসন ঘটে। দশম শতকের অসমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'কালিকাপুরাণ' গ্রন্থ এই সাক্ষ্য বহন করে যে তার কয়েক শতক পূর্বেই সংস্কৃতচর্চা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। 'কালিকাপুরাণ' যদিও ইতিহাস নয়, তথাপি এই গ্রন্থে অনেক পরোক্ষ ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রকৃতপক্ষে বর্মন বংশের রাজত্বকালে আর্যীকরণ যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই কথার সাক্ষ্য বহন করে আসছে বর্মন বংশের দিনে সপ্তম শতক থেকে পাওয়া তাম্রশাসনসমূহ। বর্মন বংশের চতুর্থ শতকের পুষ্য বর্মন থেকে সপ্তম শতকের ভাস্কর বর্মন পর্যন্ত মোট বারোজন রাজার কথা জানা গেছে। ভাস্কর বর্মার সময়ের তাম্রশাসনগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় যে এই বংশের শুরু নরকাসুর থেকে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না-করে এ-কথা বলা চলে— 'কালিকাপুরাণ'-এ বর্ণিত বিবরণ থেকে সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের আলোকে অনুসন্ধান করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে মিথিলা-কেন্দ্রিক আর্যশক্তির একটি গোষ্ঠী কামরূপ তথা প্রাগজ্যোতিষপুরের মৈরাং দানব রাজাকে হত্যা করে আর্যদের দ্বারা প্রতিপালিত নরকাসুরকে এই রাজ্যে বর্ণাশ্রমপ্রথা প্রবর্তন করার জন্য সিংহাসনে বসিয়ে যান। কিন্তু নরকাসুর পরবর্তী সময়ে শোণিতপুরের বাণাসুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। ফলে আর্যরা পুনরায় এসে নরকাসুরকে বধ করে ভগদত্তকে রাজা করে যান এবং এই ভগদত্তের কাল থেকেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আর্যীকরণ তথা সংস্কৃতায়ন শুরু হয়। কাব্য-মহাকাব্য বা পুরাণের আখ্যানের উপর নির্ভর না-করে অনুমান করা যায় যে নরকাসুর এবং ভগদত্ত থেকে চতুর্থ শতকের পুষ্য বর্মন পর্যন্ত কালের মধ্যে আরো কয়েকজন রাজা রাজত্ব করেছেন। অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম বা খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আর্যীকরণ আরম্ভ হয়েছিল বলে অনুমান করা চলে।

এই পর্যন্ত পাওয়া চতুর্থ-পঞ্চম শতকের নগাজরী খনিকর গ্রামের শিলালেখ এবং পঞ্চম শতকের সুরেন্দ্র বর্মার উমাচল শিলালেখ— এই দুই লেখ ইতিপূর্বে সংস্কৃত ভাষা এবং আর্যসংস্কৃতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। সুরেন্দ্র বর্মার শিলালেখ-এ বলভদ্রস্বামীর পূজার জন্য একটি গুহামন্দির নির্মাণ করার ঘোষণা খোদিত হয়ে আছে। বলভদ্রস্বামীর নামটি গুপ্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থাকার ইঙ্গিত বহন করে। তা হলেও তখন পর্যন্ত আমরা আজ যে-ভাষাকে অসমিয়া নামে চিহ্নিত করছি সেই ভাষার জন্মের নিশ্চিত সংবাদ পাই না। কিন্তু নিধানপুর তাম্রশাসনে খোদাইকরের নাম 'কালিয়া' বলে খোদিত আছে। কালিয়া নামটি সংস্কৃত নাম নয়। তা ছাড়া কালিয়ার 'ইয়া' প্রত্যয়টিও সংস্কৃত প্রত্যয় নয়। এটা আর্যভাষা সংস্কৃতির বৃত্তে প্রবেশকারী অ-আর্য স্থানীয় কোনো ব্যক্তির নাম হতে পারে। তদুপরি পঞ্চম শতকের সুরেন্দ্র বর্মার শিলালেখে থাকা চতুর্থ পঙ্‌ক্তি 'স্বামিনায় ইদয়, গুহং' এই শব্দগুলির সংস্কৃত শুদ্ধ নয়, হওয়া উচিত ছিল 'স্বামিনঃ ইয়ংগুহা'। এরকম ভুল শুদ্ধভাবে সংস্কৃত না-জানা স্থানীয় লেখকের অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে। ঠিক যেভাবে নগাজরী খনিকর গ্রামের লেখ-এ থাকা অন্তঃস্থ-'ব' এবং 'র' অক্ষর দুটির ব্যবহারে অসমিয়া ভাষায় 'ৰ' ও 'ৱ' প্রয়োগ সংস্কৃত উৎসের ইঙ্গিত দেয়।

পূর্বমাগধী অপভ্রংশ থেকেই হোক বা কামরূপী প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে হোক, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় গড়ে-ওঠা আর্যমূলীয় এই ভাষাটির মধ্যে যে অ-আর্য মূলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কথ্যভাষার রূপ ও ধ্বনির কিছু-না-কিছু উপাদান প্রবেশ করছিল সে-কথার আভাস রয়েছে। কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মার রাজ-আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ। তিনি দিনলিপিতে উল্লেখ করেছেন, 'কামরূপের ভাষা মধ্য ভারতের ভাষা থেকে কিছু পৃথক।' এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, সপ্তম শতকে এই ভাষা নিজস্ব সমগোত্রীয় আর্যমূলীয় ভাষা থেকে কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য আহরণ করে মানুষের মুখের ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

ভাষা সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করে, পণ্ডিতেরা ভাষা সৃষ্টি করেন না বা করতে পারেন না। পণ্ডিতেরা পরে প্রচলিত ভাষার অলিখিত নীতি-নিয়মগুলিকে লিখিত রূপ দিয়ে ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। অসমিয়া ভাষাকেও এভাবেই আর্যমূলীয়

ভাষার আধারে মূলত অ-আর্য মূলের স্থানীয় মানুষেরা নিজেদের উপযোগী করে সকলের জন্য গ্রহণীয় কথিত ভাষার ছাঁচে গড়ে তোলেন। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙের মন্তব্যটি এই ভাষার সেই সময়ের অস্তিত্বের উল্লেখ করে গেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হতে পারে, এই ভাষার লিখিত রূপের সাক্ষ্য আমরা কবে থেকে পাচ্ছি।

কথ্যরূপে গদ্য পূর্বে হলেও লিখিত রূপে পদ্য সব সময় সব ভাষায় প্রথমে সৃষ্টি হয়ে আসছে। অবশ্য পদ্যের সৃষ্টি প্রথমে হলেও তা গদ্যভাষার আধারেই হয়। অসমিয়া ভাষার ক্ষেত্রে লিখিত গদ্যের নিদর্শন পঞ্চদশ শতক থেকে পাওয়া গেলেও পদ্যের সৃষ্টি অষ্টম-নবম শতক থেকে আরম্ভ হয়েছিল। এই সময়টিকে বলা হয় 'প্রত্ন-অসমিয়া ভাষার যুগ'। প্রত্ন-অসমিয়া ভাষার এখনও পর্যন্ত পাওয়া সাক্ষ্য হল বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলীর নিজেদের বলে দাবি করা চর্যাপদগুলি। এই ভাষাগুলির জন্মের উৎস এবং প্রথম বিকাশের স্তরের সঙ্গে থাকা রূপগত ও ধ্বনিগত সাদৃশ্যই এরকম দাবির আধার। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ODBL-এ বাংলাভাষার সঙ্গে থাকা সাদৃশ্যগত সম্পর্কের কথা দেখিয়েছেন। অন্য সকলেও সেই দাবি করেন। এই দাবিই এই ভাষাগুলি যে যথার্থ ভগ্নীভাষা সে-কথা প্রমাণ করে আসছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, চর্যাপদে ব্যবহৃত অনেক শব্দ, ক্রিয়ারূপ, বিভক্তি, প্রত্যয়, নঞর্থক শব্দরূপ, স্ত্রীবিভক্তি, বহুবচন বোঝানো প্রত্যয়, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদি মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এখনও অসমিয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এরকম বৈশিষ্ট্য বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলীতে এত বিস্তৃতভাবে বোধ হয় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া চর্যাপদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বজ্রযান তথা সহজযান যে তিব্বতীয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল এবং যৌনাচার সাধন এর অঙ্গীভূত হয়েছিল, তার পরবর্তী অপভ্রষ্ট রূপের উপাদান অসমের 'রাতিখোৰা' এখনও বর্তমান থাকলেও কোনো কোনো অনুষ্ঠানে কমে গেছে। হিউয়েন সাঙ কামরূপে অনেক বৌদ্ধের গোপনে অবস্থান করার কথা বলেছেন। এই উল্লেখ সে-সময়ের সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম সাধনের রূপটির ইঙ্গিত বহন করছে। তদুপরি পরবর্তীকালের (১৭/১৮ শতকের) 'গুরুচরিত কথা'-য় উল্লেখিত 'টাটকীয়া বৌদ্ধ' যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শংকরদেব এরকম তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বামাচারী (নারী-সম্পর্কীয় আচরণকারী) বলে নিন্দা করেছেন। এবং কলির শেষে কল্কি অবতার হয়ে ভগবান এরকম বামাচারী বৌদ্ধদের সংহার করে সত্যযুগ প্রবর্তন করবেন এমন সম্ভাবনার কথা 'ভগবানের চতুর্বিংশতি অবতার'-এর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, অসমিয়া ভাষার সঙ্গে পূর্বমাগধী ভাষার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হলেও শৌরসেনী প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত শব্দের ব্যবহার অসমিয়া ভাষার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য বহন করছে। মারাঠি ও গুজরাটি ভাষার শব্দের সঙ্গে মিল আছে এরকম কোনো কোনো শব্দ তার সাক্ষ্য বহন করছে। চর্যাপদগুলির ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের উপাদান পাওয়া যায়। অবশ্য তার উপর পূর্বী ভাষার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে। এই কথাও উল্লেখযোগ্য যে চর্যাপদগুলি লেখার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত সাঁচিপাত (অগুরু গাছের ছাল) অসমেই পাওয়া যায়। এখনও সাঁচিগাছ (অগুরু গাছ) স্বাভাবিকভাবে অসমের মাটিতে জন্মায়।

অষ্টম-নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বলে অনুমিত চর্যাপদগুলির পরবর্তী প্রায় এক-দেড় শতকের ভেতর রচিত কোনো পদ্য বা গদ্য পুঁথি এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু এই সময়সীমার মধ্যে অসমিয়া ভাষা-যে সবদিক থেকে ক্রমে একটি উচ্চ পর্যায়ের ভাষার রূপ লাভ করেছিল তার প্রকাশ ঘটে চতুর্দশ শতকে। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে জন্মলাভকারী শংকরদেবের পূর্ববর্তী মাধব কন্দলীর বরাহী রাজা মহামাণিক্যের অনুরোধে 'বাল্মীকি-রামায়ণ'-এর চতুর্দশ শতকে করা অসমিয়া রূপান্তরে ভাষাটির এক পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপ দেখা যায়। কাব্য হিসাবেও এই গ্রন্থ কেবল অসমিয়া ভাষার নয়, ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যেও এক উল্লেখযোগ্য কৃতি। শংকরদেবের ন্যায় একজন সন্ত, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, গীতিকার, কবি, নাট্যকার, শিল্পীর মাধব কন্দলীকে 'অপ্রমাদী কবি' বলে আখ্যা দেওয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শংকরদেব-পূর্ব হরিবর বিপ্র, হেম সরস্বতী, কবিরত্ন সরস্বতী, রুদ্র কন্দলি প্রমুখ কবির কর্মও এই যুগটিকে সমৃদ্ধি দান করে গেছে। কিন্তু চতুর্দশ শতক পর্যন্ত লিখিত গদ্যের কোনো নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়নি।

॥ দুই ॥

অসমিয়া লিখিত গদ্যের সূচনা

শংকরদেব (১৪৪৯-১৫৬৮) ছিলেন মধ্যযুগের অসমের তথা সাংস্কৃতিক ভারতবর্ষের এক মহৎ প্রতিভাস্বরূপ পুরুষ।

বেদ-উপনিষদ, কাব্য-মহাকাব্য, পুরাণ-উপপুরাণ, ভাষা-ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, তথা অলংকার শাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, সংগীত (নৃত্য-গীত-বাদ্য) শাস্ত্র, চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্য এই সমস্ত দিকে সমান অধিকারী শংকরদেবের সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 'নামধর্ম' প্রচার এবং এর সঙ্গে সংগতি থাকা জীবন যাপনের প্রণালির প্রবর্তনে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে গেলে, এককভাবে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। অসমিয়া লিখিত গদ্যের ইতিহাসও জন্ম নিয়েছে শংকরদেবের হাতে। বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া বলেছেন—

"অসমীয়াৰ গৌৰৱৰ বিষয় যে আধুনিক ভাৰতীয় আর্যভাষাসমূহৰ ভিতৰত অসমীয়াতে প্ৰথমে গদ্য সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। বঙালী গদ্যৰ প্ৰাচীন নিদর্শন হৈছে বৈষ্ণৱসাধকসকলৰ 'কড়চা'-সমূহ ; কড়চাৰ প্ৰাচীনতম পুথিৰ ৰচনাকাল ১৬০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৮১-৮২ খ্ৰীষ্টাব্দ বুলি অনুমান কৰা হৈছে।"

(অর্থাৎ, অসমিয়ার গৌরবের বিষয় যে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা সমূহের মধ্যে অসমিয়াতে প্রথম গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন বৈষ্ণবসাধকদের 'কড়চা'-সমূহ ; কড়চার প্রাচীনতম পুঁথির রচনাকাল ১৬০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৮১-৮২ খ্রিষ্টাব্দ বলে অনুমান করা হয়েছে।)

অসমিয়া লিখিত গদ্যের ইতিহাস শংকরদেব থেকেই শুরু। শংকরদেব-মাধবদেব প্রমুখের নাটকের গদ্যেই এই ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য এই গদ্য সমসাময়িক কথ্য ভাষার গদ্য ছিল না। বরং কৃষ্ণকেন্দ্রিক বিষয়ে ভক্তিধর্মের প্রতি আকর্ষণ এবং বিশ্বাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি ব্রজধামের আর মিথিলার ভাষার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে এই গদ্য নাটকের জন্য রচনা করেছিলেন শংকরদেব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে শংকরদেব নিজের লেখা নাটকগুলিকে নাট বা যাত্রা বলে অভিহিত করেছিলেন, যদিও এই নাটকগুলি ছিল মুখ্যত গীতি-নৃত্য-নাট্য স্বরূপ। মাধবদেবের নাটকগুলি আকারে ছোট এবং শিশু কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক। এগুলিকে বলে ঝুমুরা। শংকরদেবের প্রতিষ্ঠিত এই ধারার নাটকগুলি পরবর্তীকালে 'অঙ্কীয়া নাট' এবং এরকম নাটকের অভিনয় 'অঙ্কীয়া ভাওনা' রূপে পরিচিত হতে থাকে। এবং এখানে ব্যবহৃত কৃত্রিম অসমিয়া ভাষাটি ব্রজাবলী (ব্রজবুলি নয়) নামে পরিচিত হল। নাটকগুলিকে অঙ্কীয়া বলার বিভিন্ন কারণ পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন, কিন্তু শংকরদেবের সম্মুখে একাধিক অঙ্ক সংবলিত সংস্কৃত নাটকগুলি থাকলেও তিনি সংস্কৃত নাটকের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি। তিনি একটি অঙ্কের ভিতরেই সংশ্লিষ্ট কাহিনির দৃশ্যগুলি পরিকল্পনা করেছিলেন। সেজন্যই এই নাটকগুলিকে পরবর্তীকালে অঙ্কীয়া নাট বলা হল— এই যুক্তিটি অধিক শক্তিশালী। যে যা-ই হোক, অসমিয়া লিখিত গদ্যের জন্ম নাটকে এবং এই গদ্য ব্রজাবলী ধারার অসমিয়া গদ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। শংকরদেবের নাটকে সংস্কৃত শ্লোক, গীত এবং কথা এই তিনটির মাধ্যমে নাটকীয় ঘটনার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আমরা সূত্রকারের দেওয়া বর্ণনার একটি অংশ 'রুক্মিণী হরণ' নাট থেকে তুলে ধরছি—

সূত্র।। আহে লোকাই ঃ সে গোসানি দেৱি ৰুকমিনি ঃ ঐচন প্ৰৱেস কয়ে কহু ঃ নৃত্য কয়ে ঃ একপাস হুয়া ৰহল। আহে সামাজিক লোক ঃ তদনন্তৰ প্ৰস্তুত ৪৬
কথা সুনহ ঃ সুৰভি নাম এক ভিক্ষুক ভাট ঃ কুণ্ডিন নগৰা হন্তে ঃ কৃষ্ণক ভেট পাৱাল ঃ তাহে দেখি ৪৭
শ্ৰীকৃষ্ণ বাত পুচত।

রুক্মিণীর দূতস্বরূপে রুক্মিণীর পত্র নিয়ে বিপ্র বেদনিধি দ্বারকা পৌঁছন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে তাঁর দ্বারকা আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন এভাবে—

হে স্বামী শ্ৰীকৃষ্ণ ঃ তুহু জগতক হামার কমন কুখল ঠিক। তুহু দৈৱকী পুত্ৰ ঃ সোহি নহি ঃ ব্ৰহ্মা মহেস সেৱিত ঃ শ্ৰীনাৰায়ন ঃ সে তুহু ভূমিক ভাৰ হৰন নিমিত্ত অৱতাৰ ভেলি থাক ঃ অঃ তোহোক মহিমা কি কহব। হামু জদৰ্থে আৱলু তা সুনহ ঃ হামাৰ বিদৰ্ভৰাজনন্দনি ৰুকমিনি ঃ ভিক্ষুক মুখে তোহাৰি গুনৰূপ সুনিএ ঃ মনে স্বামি ভাৱে বৰল ঃ সে কৈন্যাক বিবাহ কৰিতে ঃ পাপি সিসুপাল আৱল ঃ তাহে দেখি এ ৰাজকুমাৰি মৰৈচে। অঃ হামু কি কহব ঃ এক পতিআ লেখি পঠাৱল থিক ঃ তাহেক দেখহ।।

বেদনিধির হাতে রুক্মিণী কৃষ্ণকে যে-পত্র পাঠিয়েছিলেন সেই পত্রে সম্বোধন বাক্য সংস্কৃতে লিখে চিঠিটি ব্রজাবলীতে লিখেছিলেন। এই চিঠিটিও অসমিয়া ভাষার পত্র-সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যেও এই পত্র-সাহিত্য প্রথম হতে পারে।

মাধবদেব রচিত ঝুমুরাগুলিও এই অসমিয়া গদ্যের নিদর্শন তুলে ধরেছে। শংকরদেবের আরম্ভ-করা এই নাটকীয় গদ্য

পরবর্তীকালের বৈষ্ণব ধর্মাধিকাররা ব্যবহার করে এসেছেন। এখনও অসমের নগাঁওয়ে এই 'ব্রজাবলী অসমিয়া' ভাষায় ভাওনার নাট রচনা করার প্রথা চলে আসছে। এজন্য, এই নাটকীয় অসমিয়া গদ্য শংকরদেবের হাতে সৃষ্ট হয়ে তাঁর তিরোভাবের পরেও বন্ধ হয়ে যায়নি। এই গদ্যের একটি ধারা এখনও বয়ে চলেছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল— শংকরদেবের সৃষ্ট অসমিয়া ব্রজাবলীর শব্দরূপের ছাঁচটিতে ব্রজভাষা বা মৈথিলীর রূপ থাকলেও বাক্য গঠনের রীতি ও শব্দপ্রয়োগে অসমিয়া কথ্যভাষার সুরটিই ফুটে উঠেছে। 'পারিজাত হরণ' নাটের শশী-সত্যভামার বিবাদে অসমিয়া গ্রাম্য জীবনের ভাষার রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। সত্যভামার সংলাপের কিছু অংশ তুলে ধরছি।

সত্যভামা ঃ অয়ে ইন্দ্রাণী, জগতক পৰমগুৰু হামাৰি
স্বামী যাহাৰ নাম সুমৰণে মহা মহা পাপী সৰো সংসাৰ
নিস্তাৰে, তাহেক অতয়ে নিন্দা কৰহ। অয়ে নিলাজিনী
মৰিতে নজানৰ। তোহোক স্বামী ইন্দ্ৰক কথা কহিতে
ঘিণেসে উপজে।...

শংকরদেবের গদ্যে শব্দরূপ, ধাতুরূপ এবং পদপ্রয়োগে প্রাকৃতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, পদের শেষে স্বরধ্বনি থাকার জন্য গঠনও সংগীতময় হয়ে উঠেছে। তদুপরি তৎসম শব্দ থেকে উদ্ভূত ঘরিণী, মাই, বিহী, পরনাম, পরসাদ ইত্যাদিতে দূরাগত প্রাকৃতের সুর শোনা যায়। কিন্তু তা হলেও আধুনিক অসমিয়া ভাষায় ব্যবহৃত বিভক্তির প্রয়োগ ও অঙ্কীয়া নাটের গদ্যে ব্যবহৃত বিভক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। লক্ষণীয় যে, শব্দ বিভক্তির প্রয়োগবিধিই একটি ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বহু পরিমাণে ধরে রাখে। অসমিয়াতে প্রথমা বিভক্তির চিহ্ন— এ, ই ; দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন— ক ; তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন— রে, দি, দ্বারা ; চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন— অক, লৈ ; পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন— পরা ; ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন— র এবং সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন— ত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে শংকরদেবের পূর্বে কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লিখিত গদ্যের জন্ম হয়নি। শংকরদেবের পূর্বে, পঞ্চদশ শতকে মিথিলার রাজার আদেশে বিদ্যাপতি ঠাকুরের লেখা 'গোরক্ষ বিজয়' নাটকের সংলাপ সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল। কেবল এই নাটকের গীতগুলি 'মৈথিল' ভাষায় লেখা।

॥ তিন ॥

লিখিত গদ্যের প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্ব

শংকরদেবের গদ্য ও পদ্যের প্রভাব পরবর্তীকালের লেখকদের লেখা ধর্ম সম্বন্ধীয় পুঁথিগুলির উপর পড়েছে। অসমিয়া প্রাচীন গদ্যকে একটি নিজস্ব মাত্রা প্রদান করেন শংকরদেবের পরবর্তীকালের ভট্টদেব (১৫৫৮-১৬৩৮)। ভট্টদেবের সম্পূর্ণ নাম ছিল বৈকুণ্ঠনাথ কবিরত্ন ভাগবত ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন শংকরদেবের অন্যতম শিষ্য, পরবর্তীকালের 'ব্রহ্ম সংহতি'-র প্রতিষ্ঠাতা দামোদরদেবের শিষ্য এবং সত্রের 'ভাগবতী' বা ভাগবত পাঠক।

পাটবাউসীতে দামোদরদেব সত্র স্থাপন করে থাকতেন এবং ভট্টদেব পাটবাউসীর কাছে বড়নগরে ছিলেন। কোচ রাজা পরীক্ষিত নারায়ণের নির্দেশক্রমে দামোদরদেব পাটবাউসী থেকে বিজয়নগরে যাওয়ার সময় ভট্টদেবকে ডেকে এনে কথায় 'ভাগবত' রচনা করার জন্য এই বলে নির্দেশ দিলেন—

আৰ এক জগত ঈশ্বৰ আজ্ঞা ধৰা।
কথাবন্ধে এক খণ্ড ভাগৱত কৰা।
পূর্ব্বে মহাপুৰুষে কৰিলা দশ স্কন্ধ।
কীর্ত্তন ভটিমা ছবি দুলৰী সুচ্ছন্দ।।
তাত কৰি সুগম কৰিয়ো ভাগৱত।
স্ত্রী শূদ্র সর্ব্বলোকে বুঝে যেন মত।
...
প্রভু দামোদৰৰ আজ্ঞায়ে মহাসন্ত।
শ্লোক ভাঙ্গি ভাগৱত কথা কৰিলন্ত।।
অবিৰোধ স্ত্রী শূদ্র চাণ্ডালে পঢ়য়।
সঙ্খেপিয়া কথাৰূপ কৈলা মহাশয়।।

ভট্টদেব গুরুর আদেশে কথায় ভাগবত পুঁথি রচনা করেন। ভাগবতের পরে তিনি রচনা করেন কথায় গীতা পুঁথি। দামোদরদেব পূর্বে মহাপুরুষ শংকরদেবের ছন্দোবদ্ধ রূপে ভাগবত, কীর্তন প্রভৃতি রচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সাধারণ মানুষ যাতে আরো সহজে বুঝতে পারে তাই কথায় ভাগবত রচনা করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অসমিয়া কথা-সাহিত্যের ভিত্তি গড়ে তোলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী পরবর্তীকালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত কথা-গীতার ভূমিকায় সঠিকভাবেই বলেছেন, 'অসমীয়া গদ্য-সহিত্যের সৃষ্টিকার্যে ভট্টদেব যন্ত্র মাত্র দামোদরদেবই যন্ত্রী।'

হেমচন্দ্র গোস্বামী 'কথা-ভাগবত' এবং 'কথা-গীতা'-র ভাষার বিষয়ে আলোচনা করে বলেছেন—

"কথা-ভাগৱতৰ ভাষাতকৈ কথা-গীতাৰ ভাষা বেছি কোমল আৰু সৰল। কথা-ভাগৱতত যিমান পুৰণি অপ্ৰচলিত শব্দৰ ব্যবহাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কথা-গীতাত সিমান নাই। কথা-ভাগৱতৰ ৰচনাতকৈ কথা-গীতাৰ ৰচনাও বেছি প্ৰাঞ্জল আৰু মধুৰ। ওপৰত দেখুওৱা হেতুবাদৰ পৰা আমি কথা-গীতাক, কথা-ভাগৱতৰ পাছৰ গ্ৰন্থ বুলি অনুমান কৰোঁ।"

(কথা-ভাগবতের ভাষা থেকে কথা-গীতার ভাষা বেশি কোমল ও সরল। কথা-ভাগবতে যত পুরনো অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় কথা-গীতায় ততটা নেই। কথা-ভাগবতের রচনা থেকে কথা-গীতার রচনাও বেশি প্রাঞ্জল ও মধুর। উপরে দেখানো হেতুবাদ থেকে আমরা কথা-গীতাকে, কথা-ভাগবতের পরবর্তী গ্রন্থ বলে অনুমান করি।)

কথা-ভাগবতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। তদুপরি শংকরদেবের ছন্দোবদ্ধ রূপে রচিত ভাগবতের শব্দচয়ন এবং অলংকার প্রভৃতির প্রভাবও পড়েছে। ভট্টদেবের গদ্যকে মহেশ্বর নেওগ 'মধুর কাব্যসুলভ গদ্য' বলে অভিহিত করেছেন। ভট্টদেবের গদ্যের নিদর্শন এই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করে—

"শুকে কহন্ত, "হে মহাৰাজা, এই বিৰাট ধাৰণা কৰি পূৰ্ব্বত ব্ৰহ্ম হৰিক তুষ্ট কৰাই জগত সৃজিলা। আবে তাৰ সাধ্য সূক্ষ্ম ধাৰণা শুনা, যাক ঢাকি বেদে নানা কৰ্ম্ম কহে, যাৰ ফলে পুৰুষে সংসাৰত ফুৰে। এতেকে বিৱেকীজনে আন কৰ্ম্ম এৰি দেহ-নিৰ্ব্বাহৰ অৰ্থে যত্ন কৰিব, অধিক নকৰিব, তাকো সুখ-বুদ্ধি নেদিব। তাকো যদি শ্ৰম দেখে এমনে প্ৰৱৰ্ত্তিবঃ মাটিত নিদ্ৰা আসিলে পাটীক লাগি যত্ন নকৰিব। বাহু শিথান হৈলে গাণ্ডুত যত্ন নকৰিব। অঞ্জলি থাকিতে ঝাৰি-খুৰিত কি কাৰ্য্য? এতেকে মহন্তসৱে আপুনাৰ হৃদয়ত হৰিক চিন্তে। হৰিব ৰূপ শুনা ঃ শ্যাম-শৰীৰ, পীত-বসন, চতুৰ্ভুজ, শঙ্খ-চক্ৰ-গদা-পদ্ম-ধাৰী, প্ৰসন্ন-মুখ, কমল-লোচন, নীল-আকুঞ্চিত-কেশ, কিৰীটি-কুণ্ডল হাৰ -অঙ্গদ-বলয়-আঙ্গুৰী-মেখলা-কিঙ্কিণী-নূপুৰে অলঙ্কৃত, শ্ৰীবৎস-কৌস্তুভ-বনলতা-আলাতা, হাস্যবদন, সদয়-নিৰীক্ষণ। এমনে সৰ্ব্বাঙ্গ চিন্তিব; পাছে চৰণৰপৰা আস্য পৰ্য্যান্তে একৈক অঙ্গ চিন্তব। যাৰে ই ৰূপত প্ৰীতি নুপজে, তাৰে পূৰ্ব্বোক্ত স্থূল ধাৰণাও কৰিব।"

ভট্টদেব নিজের ভণিতায় 'কবিরত্ন' নামটি বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছেন। হেমচন্দ্র গোস্বামীর কথা-গীতার ভাষার কোমলতার সম্পর্কে করা মন্তব্যের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। কথা-গীতার ভাষা যথার্থই গুরু-গম্ভীর সাধু ভাষা। বিরিঞ্চকুমার বরুয়া বলেছেন,

"চুটি চুটি বাক্য-সংযোগেৰে গধুৰ বিষয়বস্তু লেখকৰ অতুলনীয় ৰচনা ক্ষমতা পৰিলক্ষিত হৈছে।... এনেহে লাগে যেন নামঘৰত ৰাইজ গোট খাইছে আৰু ভাগবতীয়ে শাস্ত্ৰ পাঠ কৰি টীকাসহ ব্যাখ্যা কৰিছে, মাজে মাজে গভীৰ বিষয়ৰ প্ৰশ্ন তুলি নিজেই যেন তাৰ সমাধান কৰিছে।"

(ছোট-ছোট বাক্য-সংযোগে গভীর বিষয়বস্তু বোঝাতে লেখকের অতুলনীয় রচনাক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়েছে।... এরকম মনে হয় যেন নামঘরে জনতা জমায়েত হয়েছে এবং ভাগবত পাঠক টীকা সহ ব্যাখ্যা করছেন, মাঝে মাঝে গভীর বিষয়ের প্রশ্ন তুলে নিজেই যেন তার সমাধান করছেন।) প্রকারান্তরে বলা যায়, শ্রোতাকে সামনে রেখে বলে যাওয়া গীতার তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা ভট্টদেবের অসামান্য প্রতিভার কথা মনে করিয়ে দেয়।

ভট্টদেব নিজেই ছিলেন সংস্কৃতে বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি 'ভক্তিসার' নামে একটি সংস্কৃত পুঁথি রচনা করেছেন। তাঁর 'শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক' গ্রন্থটি অধ্যাপক লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদনা করে প্রকাশ করে গেছেন। কথা ভাগবতের বেশ কয়েকটি খণ্ড 'শ্রীমদ্ভাগবতকথা' শিরোনামে মহেশ্বর নেওগ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। তদুপরি নলবাড়ির পূর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ভট্টদেবের রচনাবলি একত্রে ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছেন।

'কথা-গীতা' বা 'ভাগবত-কথা' গ্রন্থ মূলের সরাসরি অনুবাদ নয়, বরং বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম ও আত্মসাৎ করে নিজের মতো করে প্রকাশের মধ্যেই ভট্টদেবের মৌলিকতা এবং রচনারীতির সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া বলেছেন—

"ভট্টদেৱৰ শব্দ সংগঠন সংস্কৃত প্ৰভাবান্বিত আৰু সংস্কৃত ব্যাকৰণ অনুসৃত। গতিকে এক প্ৰকাৰে তাক

নিখুঁত বুলি দৰ্শাব পাৰি। শব্দৰ ব্যৱহাৰো সঙ্গত হৈছে। শব্দৰ সুসঙ্গত প্ৰয়োগত ভাব প্ৰকাশ সুস্পষ্ট হয় আৰু উদ্দেশ্যও সফল হয়।"

(ভট্টদেবের শব্দ সংগঠন সংস্কৃত প্রভাবান্বিত এবং ব্যাকরণ অনুসৃত। কাজেই তাকে এক প্রকার নিখুঁত বলে দেখাতে পারি। শব্দের ব্যবহারও সংগত হয়েছে। শব্দের সুসংগত প্রয়োগে ভাবের প্রকাশ সুস্পষ্ট হয় এবং লেখকের উদ্দেশ্যও সফল হয়।)

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের একজন পণ্ডিত বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'আসাম ছাত্র সম্মিলন'-এর তেজপুরে অনুষ্ঠিত চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই পণ্ডিত ব্যক্তির ভাষণ থেকে কিছু কথা নীচে তুলে ধরছি—

> It should naturally thrill your hearts with pride that the great apostles of Vaishnavism in Assam, namely Sankar Deva and his worthy disciple Madhava Deva, both of them Kayasthas and who were precursors of Chaitanya wrote their classical works in verse at a time when Bengali had not produced a Krittivasa or a Kashiram Dasa nor even a prose literature worth the name. Indeed, the prose Gita of Bhattadeva composed in the sixteenth century is unique of its kind. Since I penned these lines I had an opportunity of coming across an excellent edition of this book (Katha Gita) which we owe to the patriotism and scholarchip of Pandit Hemchandra Goswami. It is a valueless treasure. Assamese prose literature developed to stage in the far distant sixteenth century which no other literature of the world reached except the writing of Hooker and Latimer in England.
>
> There has been a controversy for long about the independence and identity of the Assamese language. This is extremely foolish.

ভট্টদেবের গদ্য অঙ্কীয়া নাটের অসমিয়া ব্রজাবলী থেকে শিষ্ট অসমিয়া গদ্যের স্তর যোলো শতকে প্রতিষ্ঠা করে। তদুপরি তাঁর ভাগবত কথার গদ্য অসমিয়া গদ্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। কখনো ভাবকে অধিক প্রকাশযোগ্য করে তুলতে ব্যবহার করেছেন কথা গদ্যের মতো ছোট ছোট বাক্য এবং কখনো-বা বিষয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে বাক্য রচনা করেছেন। বাক্যের এই দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তদুপরি অক্ষরবিন্যাসে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ মেনে চলার ফলে শব্দের রূপ স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতের পরিবর্তে সংস্কৃত আদর্শকে অনুসরণ করেছে। অসমিয়া লিখিত গদ্যের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর ভট্টদেবের হাতেই সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

॥ চার ॥

অসমিয়া লিখিত গদ্যের প্রথম পর্বের বিস্তার

বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া বলেছেন, "ভট্টদেৱৰ ৰচনাৰ ৰীতি অনুসৰণ কৰি সমসাময়িক ভালেমান পণ্ডিতে সংস্কৃত পুথি অসমীয়া গদ্যলৈ অনুবাদ কৰে। এইসকলোবোৰ পুথি এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই।"

(ভট্টদেবের রচনার রীতি অনুসরণ করে সমসাময়িক অনেক পণ্ডিত সংস্কৃত পুথি অসমিয়া গদ্যে অনুবাদ করেন। এই সবগুলো পুথি এখনও জনসম্মুখে আসেনি।)

সাধারণত সংস্কৃত পুঁথির টীকা ভাষ্য টীকাকার পণ্ডিতেরা সংস্কৃতেই করেছিলেন। অসমেও শংকরদেব তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থের টীকা সংস্কৃত ভাষাতেই করেছেন। লক্ষণীয় যে অষ্টাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত অসমিয়া পুঁথির টীকাভাষ্যের গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। এরকম প্রথম গ্রন্থ হল মাধবদেবের 'নামঘোষা' পুঁথির পরশুরামের করা গদ্য অনুবাদ— 'কথাঘোষা'। এই গ্রন্থে প্রত্যেক স্তবকে ঘোষা তুলে ধরে গদ্যে তার অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তদুপরি প্রসঙ্গক্রমে আবশ্যক মনে করে টীকা সংযোগ করা হয়েছে। এই পুঁথি ১৬৩৭ শকে অর্থাৎ ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে লেখা হয়েছে। একই সময়ে গদ্যে আরো কয়েকটি পুঁথি রচিত হয়েছে। তার মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় সাত্বত তন্ত্র পুঁথির অনুবাদ, রঘুনাথ মহন্তের কথা-রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থও স্মরণীয়। হেমচন্দ্র গোস্বামী 'অসমীয়া পুথির বর্ণনাত্মক তালিকা' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকশিত হেমচন্দ্র গোস্বামীর Descriptive Catalogue of Assamese Manuscript) শীর্ষক গ্রন্থে 'পদ্মপুরাণ' নামে একটি গদ্য পুঁথি (১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দ)-র উল্লেখ করেছেন। এই পুঁথির ভাষা ভট্টদেব বা তাঁর পরবর্তী লেখকদের মতো নয়। বরং কথিত শিষ্ট গদ্যের আদর্শ হয়ে পড়েছে। এই সময়ের অসমিয়া গদ্য পুঁথিগুলি এখনও সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত ও অধীত হয়নি।

ব্যাবহারিক বিষয়ের পুঁথির গদ্য

ঊনবিংশ শতকের পূর্বে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের পুঁথিগুলি অসমিয়া গদ্যের বিকাশ ও বিবর্তনের এক বিশেষ অধ্যায়ের পরিচয়বাহী। এই পুঁথিগুলির মধ্যে অনেকগুলির বিষয় সংস্কৃত থেকে অনুবাদ নতুবা সংস্কৃতকে আধার করে রচনা করা হয়েছে। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুবাদ করা এরকম পুঁথিতে সংস্কৃতের প্রভাব থাকলেও বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের ব্যাখ্যার সময় তৎসম শব্দ ব্যবহার না-করে কথ্য শিষ্ট গদ্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এইসব গ্রন্থের মধ্যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, নিদান, জ্যোতিষ, অঙ্কের আর্যা, নৃত্য-গীতের পুঁথি, ঘরদুয়ার নির্মাণ বিষয়ক পুঁথি প্রভৃতি প্রধান। হস্তিবিদ্যার্ণব, ঘোড়ানিদান প্রভৃতি গ্রন্থের বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে অসমেই হস্ত্যায়ুর্বেদ নামের সংস্কৃত গ্রন্থটিও রচিত হয়েছিল। হস্তিবিদ্যার্ণব সচিত্র গ্রন্থ। এর ভাষার দুটি উদাহরণ নীচে তুলে ধরা হল—

ক) সিকলৰ আগ-মঙ্গহৰ পৰা জি জাত হস্তি হৈছে তাৰ লক্ষণ কাণৰ ওপৰ ভাগ ডুখৰিয়া হেঙুলৰ বৰ্ণৰ সদৃশ তাৰ প্ৰকৃতি বালকে ওঁমোলাভাৰে ঊমলি থাকে। এই হস্তি ছন্দনৰ গছ থকা হাবিত থাকে। এক দেউঁৰৃসিএ অৰণ্যত ফুৰোতে সেই হস্তিক দেখি সাম্পতি নামে ৰাজাত কলেহি। পাছে ৰাজায়ে গৈ সেই হস্তিক ধৰি আনিলে। তাৰে পৰা অনেক ৰাজ্যলৈ বিয়াপিল। এতেকে ৰাজাসকলে এনে হস্তিক ছিনি ৰাজ্যলৈ আনিব তেহে ৰাজাৰ সম্পত্তি বাঢ়ে। তাত জি মাউত উঠিব তাৰ লক্ষণ। তাৰ জন্ম পুস মাসত হ'ব ধনুৰসিয়া বানৰবৰ্গ গাৰবৰ্ণ কলা হ'ব দিঘলে তিনি হাত এক বেগত হয়। এনে মাউঁত টো উঠি টিপনি নেৰিব জদি মন বাঢ়ে তেহে খুছিব তেহে ভাল।

খ) ঘোৰা টাঙ্গন ব্যাধি
লক্ষণ— এক ভৰি খোৰাই যদি তাকে ঘোৰা টাঙ্গন ব্যাধি বোলে। দৰৱ— তিনটা বেত গজালি পুৰিব, তেজমুইৰ সিফা, দোম চোৰথৰ সিফা, ভোটাজালুক তিনিকো একত্ৰ কৰি বঙ্গ লালোনৰে খুৱাব ঘোৰাটাঙ্গন ব্যাধি নাস। অথবা লাইতৰুণ নাঙ্গল ভঙ্গাৰ সিপা, তেজমুইৰ সিপা গুনৰাজ, হাগা দেণ্ডাৰাৰ গু উইৰ মাটি সবাকে একত্ৰ কৰি খুন্দি টেকেলিত ভৰাব। গুনৰাজ কৰা ভাটুৰি, ৰতৰাজ তিনিকো খুন্দি টুপলিকৈ টেকেলি মুখত দি তপতাই সেক দিব ঘোৰা টাঙ্গন ব্যাধি নাস।

এই গদ্য অসমিয়া বুরঞ্জীর গদ্যের স্তরের। ধর্ম সম্বন্ধীয় পুঁথির গদ্য থেকে কথ্যভাষার গদ্যে অসমিয়া লিখিত গদ্যের বিবর্তন মধ্যযুগে এভাবেই ঘটেছিল।

॥ পাঁচ ॥

কাল-নিরপেক্ষ গদ্য

অসমিয়া মন্ত্র সাহিত্য অসমিয়া গদ্যের অন্য এক নিদর্শন। এই গদ্যের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিতে আর্য ও অ-আর্য দুই ধারারই প্রভাব পড়েছে। একদিকে অথর্ববেদের যেমন উল্লেখ আছে অন্যদিকে এই গদ্যে বিভিন্ন অসমিয়া লোকভাষা এবং অ-আর্য লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতির প্রভাবও পড়েছে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, ভূত, প্রেত, ডাইনি, যক্ষিণী, দৈত্য, দানব, জীব-জন্তু, সরীসৃপ, অপেশ্বরী, বুঢ়াডাঙ্গরীয়া ইত্যাদি লোককল্পনায় প্রবেশ করে মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারে বলে বিশ্বাস করে লৌকিক-অলৌকিক অনেক বিষয় থেকে রক্ষা পেতে ঝাড়-ফুঁক, বনৌষধির ব্যবহার ইত্যাদির প্রয়োগবিধির সঙ্গে মন্ত্রগুলি জড়িত। অন্যদিকে কোনো অপ্রিয় ব্যক্তির বা শত্রুর ক্ষতি বা অমঙ্গল করার জন্য ব্যবহৃত মন্ত্রও আছে। তার সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য সেই লোকের চুল, নখ, পরার কাপড়ের অংশ ইত্যাদি সামগ্রী ব্যবহার করার বিধান আছে। শুধু তা-ই নয়, কাউকে আকর্ষণ করতে, বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য, বিবাহ ভেঙে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত কিছু মন্ত্রও প্রচলিত ছিল। এইগুলি অথর্ববেদের 'স্ত্রী-কর্মাণি'-র সঙ্গে মেলে। অপদেবতা তাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত মন্ত্রে যেমন গালি-শাপ দেওয়ার, হুমকি দেওয়ার, ভয় দেখানোর মন্ত্র আছে তেমনি সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত কিছু ভালো শব্দও আছে। মন্ত্রপুঁথিসমূহের নামগুলিই ভিতরের বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দেয়। যেমন পক্ষীরাজ মন্ত্র যাতে বন্ধন করার উদ্দেশ্য আছে, সুদর্শন মন্ত্র যাতে ক্ষতি বা অমঙ্গল ঘটানোর বিষয় নষ্ট করার মন্ত্র আছে। তাম্বুল ঝেড়ে দেওয়া, ফুল ঝেড়ে দেওয়া, কলাপাতা ঝেড়ে দেওয়া, শসা ঝেড়ে দেওয়ার মন্ত্র আছে। করতী মন্ত্রপুঁথির কয়েকটি ভাগ আছে— বরকরতী, সরুকরতী, ব্রহ্মকরতী প্রভৃতি মন্ত্রপুঁথি। সবগুলির মধ্যে সরাসরি গদ্যের ব্যবহার থাকলেও প্রয়োগরীতিতে দ্রুতলয়ের ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মন্ত্রপুঁথিগুলির

গদ্যে যেমন প্রাক্-শংকর যুগের দুই-একটি প্রসঙ্গ আছে তেমনই শংকর-যুগ এবং শংকরোত্তর যুগের ভাষার ও বিষয়ের প্রসঙ্গও রয়েছে। তা ছাড়া মহাযানী বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবও এতে পড়েছে। অন্যদিকে লৌকিক আখ্যান, লোকবিশ্বাস এবং লোককল্পনা ইত্যাদির প্রভাবে মন্ত্রগুলি লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গ আর উপাদান ধরে রেখেছে। এমন-কি ইসলামীয় দুই-একটি শব্দের প্রয়োগও লক্ষণীয়। মন্ত্রপুঁথির গদ্যের অল্প কিছু নিদর্শন নীচে দেওয়া হল—

ক) মহাদেৱৰ আজ্ঞা দুর্গাব বৰ। বান্ধিলো বিড়া পশি থাক ঘৰ। মোহোৰ হুঙ্কাৰ মহাদেৱৰ বৰ। উত্তৰে বান্ধো কুবেৰৰ গড়। আকাশে বান্ধো দেৱতাগণ পাতালে বান্ধো ধনপতিগণ। জলে বন্দি কৰো জল কোৱাঁৰ সশ্যে বন্দি কৰোঁ চুচিয়া গণ।

খ) ওঙ্কাৰ শবদে ব্ৰহ্মাকে স্মৰিলা। চাৰিখান বিদ্যা এৰি বাপৰ বিদ্যা কাটো। বায়ু বান কাটো। ইন্দ্র বান কাটো। চন্দ্র বান কাটো। সূর্য্য বান কাটো। চন্দ্র শৰ কৰো খণ্ড খণ্ড। মহেশ্বৰৰ আজ্ঞা কুমন্ত্র কাটি কৰো ৰণ্ড ভণ্ড। কুৰু মহেশ্বৰৰ শৰ কাটো। বায়ু শৰ কাটো। বহ্নি শৰ কাটো। মুষ্ঠি শৰ কাটো। উলতা শৰ কাটো। পালটা শৰ কাটো। উভতা শৰ কাটো।

গ) সুদর্শন চক্রৰ ভয়ত পলোৱা ভূত-প্রেতৰ বর্ণনা থকা এটি মন্ত্র এনে ধৰণৰ — কাৰো একো খান কাণ কুলাৰ সমান। এক কাণে দুই আৰু চাৰি কাণ। এক ভৰি দুই ভৰি কাৰো কোঙা ভৰি। চক্রৰ ভয়ত সবে পলাই লৰৰি। অতি কতো ঢেলা কতো কলা কতো কুজা কতো খোলা কতো বেজীমুৱা। কতো দান্ত আছন্ত জোঙ্গা জোঙ্গা। চক্রৰ ভয়ত লাগ পলাই নিৰন্তৰ।

গদ্য-পদ্য মিশ্রিত এই রচনাগুলিই অসমিয়া গদ্যের একটি কাল-নিরপেক্ষ মিশ্রিত রূপ ধরে রেখেছে।

॥ ছয় ॥

বুরঞ্জীর গদ্য : কথিত মান্যভাষার শিষ্টরূপ

অসমিয়া গদ্যের একটি নিটোল রূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে অসমের বুরঞ্জীর মধ্যে। বুরঞ্জী শব্দের অর্থ হল জ্ঞানের ভাণ্ডার। তেরো শতকে (১২২৮) চুকাফার নেতৃত্বে আহোমরা বর্তমান অসমের উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে এই দেশে প্রবেশ করে। চুকাফা স্থানীয় বরাহী, মরাণ আদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সঙ্গে আগত লেখকদের আদেশ করেছিলেন 'যা দেখেছ, যা শুনেছ' সব লিখে যেতে। টাই-আহোম ভাষায় বুরঞ্জী লেখার এটাই ছিল সূত্রপাত। এর পর প্রত্যেক স্বর্গদেবের (রাজার) বুরঞ্জী লেখার জন্য নিযুক্ত করা লোকেরা সব ঘটনা লিখে গিয়েছিলেন। সব রাজকুমার ও পাত্রমন্ত্রীরা সকলে বুরঞ্জী জানা এবং বুরঞ্জী লিখে বা লিখিয়ে সংরক্ষণ করার কাজকে একটি দায়িত্বরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে আহোম ভাষায় বুরঞ্জী লেখা হলেও রাজা ও পাত্রমন্ত্রীদের তথা পদস্থ আধিকারিকদের প্রজার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল সে-সময়ের অসমিয়া ভাষা। পরবর্তীকালে আহোম ভাষার পরিবর্তে অসমিয়া ভাষায় বুরঞ্জী রচনার প্রথা স্বাভাবিকভাবে প্রবর্তিত হল। সেকালের সমগ্র ভারতবর্ষে এরকম নিয়ম করে বুরঞ্জী লেখার রীতি অন্য কোথাও প্রচলিত থাকার কথা জানা যায় না।

অসম বুরঞ্জীর ভাষা প্রচলিত অসমিয়া ভাষার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। পরবর্তীকালে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রচলিত অসমিয়া ভাষার মান্য রূপটির ভিত্তি গড়েছিল বুরঞ্জী সাহিত্যই। অসমিয়া বুরঞ্জী সাহিত্যের বিষয়ে Sir G.A. Grierson লিখেছেন—

> The Assamese are justly proud of their national literature. In no department have they been more successful than in a branch of study in which India, as a rule is curiously deficient. The historical works or Buranjis are numerous and voluminous. A knowledge of the Buranjis was an indispensible qualification to an Assamese gentleman. (Linguistic Survey of India).

বুরঞ্জীগুলি সম্ভ্রান্ত আধিকারিকদের দ্বারাই লেখানো হয়েছিল। সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই ভাষা একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ মান্যরূপ লাভ করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে ঘটে-যাওয়া সত্য ঘটনার বিবরণ হওয়ায় ভাষায় অলংকারের ব্যবহার বা আবেগপ্রবণতা থাকার প্রশ্নও ছিল না। বুরঞ্জীর ভাষা ষোলো শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত অসমিয়া ভাষার গদ্যের রূপকে ধরে রেখেছে। এই বিশাল বুরঞ্জী সাহিত্যের অধিকাংশ এখনও মুদ্রিত হয়নি। ড. সূর্যকুমার ভূঞা হরকান্ত বরুয়ার লেখা অসম বুরঞ্জী এবং দেওধাই অসম বুরঞ্জী, শ্রীনাথ বরবরুয়ার লেখা তুংখুঙীয়া বুরঞ্জী এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের কছারী বুরঞ্জী, জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী,

ত্রিপুরা বুরঞ্জী, সাতসরী অসম বুরঞ্জী প্রভৃতি বুরঞ্জী অসম সরকারের 'বুরঞ্জী ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ' থেকে প্রকাশ করেছেন। 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি'ও পুরনো অসম বুরঞ্জী বের করেছেন। মুক্তি চৌধুরী ইতিপূর্বে ত্রিপুরা বুরঞ্জী বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী বলেছেন,

> ইয়াৰ (পুৰণি অসম বুৰঞ্জীৰ) লিখাত ক'তো বাহুল্য কথা নাই। ক'তো অতিৰঞ্জনৰ চেষ্টা নাই, ভাষা যেনে সৰল, তেনে আঁৰ নলগা কোনো সঁচা কথাকে গোপন কৰিবৰ চেষ্টা নাই। ৰজাঘৰৰ অনেক চেঁকা লগা কথাও এই বুৰঞ্জীত খোলাখুলিভাবে লিখা আছে।

[এর (পুরনো অসম বুরঞ্জীর) লেখায় কোথাও বাহুল্য কথা নেই। কোথাও অতিরঞ্জনের চেষ্টা নেই, ভাষা যেমন সরল, তেমনি নির্দোষ, কোনো সত্য কথা গোপন করার চেষ্টা নেই। রাজপরিবারের অনেক গুপ্ত কথাও এই বুরঞ্জীতে খোলাখুলিভাবে লেখা আছে।]

অন্যান্য বুরঞ্জীর ক্ষেত্রেও কম-বেশি পরিমাণে এই এক কথাই খাটে। অবশ্য লেখকভেদে নিজস্ব রচনাশৈলীর একটি বিশিষ্টতাও স্বাভাবিকভাবে অনুভব করা যায়। লক্ষণীয় যে সুকুমার মহন্তের বাড়িতে পাওয়া পুরনো বুরঞ্জীটিতে কিছু সংলাপ লিপিবদ্ধ করা আছে। যেমন—

১৪৭৭ শকের ১৪৯৮ জ্যৈষ্ঠ মাসে ২১ মঙ্গলবারে গোহাঁই বোলে—

> "কালকেতু, ধুমা, উদ্ভণ্ড, চামৰায়, তহঁতক যে ৰাজ্য নৰনাৰায়ণে আমাৰ ঠাইক পঠাইছে কি নিমিত্তে?" কালকেতু চৰ্দ্দাৰে বোলে,— "স্বৰ্গদেও, আমাৰ নৰনাৰায়ণ ৰাজাএ আমি চাৰি জনকঁ ঠাইক পঠাইছে বোলে এইখান কহিবি যাই,— যেখন গৌড়েশ্বৰ সহিত সম্বন্ধ কৰিলেন সেকাল আমাৰ পিতা মহাৰাজ সহিত প্ৰীত হৈল। আৰ অত দিবস আমি জানিয়াছিল যে স্বৰ্গ ৰাজাসে আমাৰ আশ্ৰয়ৰ স্থান। আৰ ৰামচন্দ্ৰ, হোমধৰ, দীপসিংহ কোঁৱৰৰ ভ্ৰমৰাকুণ্ডত স্নান কৰিবাক গৈছিল, সেই জাজ্জাসৰ পৰা যে কোঁৱৰক মাৰি-ধৰি নেই ইগোট মিত্ৰৰ কোন ব্যবস্থাত কমাই হৈল?" আতে গোহাঁয়ে বুলিলে, বোলে,— "ক্ষেত্ৰিয়ৰ কত সম্বন্ধ ৰহে? আৰ দন্তে-ওঠেও কামোৰ খাই, তত্ৰাপিনেকি ভেদ কৰিবাক পাৰি? তাত্ৰিং যদি ঠাই মিত্ৰতা ৰাখে, এতেকে সমস্তে সিদ্ধি হৈতে আছে। আমি কি অধিক বুজাম।"

বুরঞ্জীর ভাষার আরো একটা উদাহরণ নীচে তুলে ধরা হল—

> "বঙ্গাল (বংগৰ নৰাবৰ সৈন্যবাহিনী) দুই-চাৰি দিন ধৰি তিনি প্ৰহৰৰ বাট খেদি নি বিজুলী নদী পালেগৈ। পাচে আমাৰ মানুহে জীয়ায়ে ঘোঁৰা পালে ১৪০, হিলৈ পালে বৰে-সৰুৱে ৬০, গুলী-খাৰ ৩০০, ঢলা তৰোৱাল পালে ২৬৭, জামদাৰ খবুৰা পালে ৩০, বাৰু ১২৭, তামৰ বৰদবা ১, এই বস্তুসকল পাই নেওগৰ পুতেকেৰ ঠাইক দিলে। নেওগৰ পুতেকেও মহাৰাজাই দি পঠালে।"

আহোম স্বর্গদেবরা (রাজাগণ) প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে প্রয়োজনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেও সাধারণত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়াস করতেন। সেজন্য চিঠিপত্রে যোগাযোগও করতেন। এমন-কি, ফারসি ভাষায় লেখা চিঠি পড়ার জন্য রাজা 'ফার্চী জানা' মানুষ রেখেছিলেন। তা ছাড়া বঙ্গের নবাবের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ করতে গিয়ে বাংলা প্রকাশভঙ্গির ব্যবহারে সচেষ্ট ছিলেন। অনেক পণ্ডিত এই চিঠিগুলিকে বাংলা ভাষার নিদর্শনরূপে দেখাতে চেয়েছেন। এই ধারণা ঠিক নয়। এমন-কি দেখা গেছে যে অনেক অসমিয়া শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি না-বোঝার ফলে পাঠোদ্ধারে ভুল হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অসমিয়া, বাংলা, ফারসি স্থানভেদে মিশ্রিত হয়ে পড়েছিল। মোমাই তামুলী বরবরুয়ার আলিয়ারখাঁকে লেখা চিঠির একাংশ নীচে তুলে ধরা হল—

> স্বস্তি নিখিলগুণৈক ধামসৰ্ব্বোপমাযোগ্য শ্ৰীযুত নবাব আহলাদ খাঁ সুজাবৰেষু। সস্নেহপূৰ্ব্বক লেখনংকাৰ্য্যঞ্চ। আগে তোমাৰ কুশল শুনি শ্ৰীল গুণৰ আশ্ৰয় সকলোপমাযোগ্য শ্ৰীযুত শুভচিত্ত স্নেহ কৰি লিখিছোঁ। আমাৰ কুশল সৰ্ব্বত্ৰে চাহি। পৰং সমাচাৰ তোমাৰ কুশল শুনি পৰম সন্তোষ। উকীল চেকমেদা ও কটকী মুখে তোমাৰ কুশল শুনিয়া পৰম সন্তোষ হৈলাম। আৰ তুমি বুলি আছা উত্তৰে বৰনদী, দক্ষিণে অসুৰ-আলি ইতিমধ্যে বন্ধ-নিবন্ধানুক্ৰমে বদকৰাল হৈলে উভয় পক্ষ ৰক্ষা হয়।

তুংখুঙীয়া বুরঞ্জীর গদ্যশৈলী ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের অসমিয়া গদ্যশৈলীর নিদর্শন—

> গৌৰীনাথসিংহ স্বৰ্গদেৱৰ পাছত, আন কোনো কোঁৱৰক ৰাজপাট খাবলৈ উপযুক্ত বিবেচনা নকৰি পূৰ্ণানন্দ

বুঢ়াগোঁহাই আৰু আনোসব পাত্ৰ-মন্ত্ৰীয়ে কিনাৰাম গোঁহাইক ৰজাৰ উপযুক্ত বুলি আনিলে। এওঁ মহাৰাজ ৰুদ্ৰসিংহ ঁদেৰৰ ভায়েক লেচাই নামৰূপীয়া ৰজাৰ পুতেক আয়ুসূত গোহাঁইৰ পুতেক কদমদীঘলৰ সন্তান আছিল। ১৭১৭ শকৰ শাওণৰ ২৩ দিন যাওঁতে ডাঙ্গৰীয়াসকলে গোহাঁয়ে কমলেশ্বৰ সিংহ নাম থ'লে। এওঁৰ মৃত্যুত ভায়েক চন্দ্ৰকান্তসিংহ চাৰিঙ্গী ৰজা ঁদেৰ হ'ল, ১৭৩২ শক ৬ মাঘ। মানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁই প্ৰমুখ্যে অন্য বিষয়াসকলে চন্দ্ৰকান্তক ৰজা ভাঙ্গি ৰাজেশ্বৰসিংহ ঁদেৰৰ নাতিয়েক ব্ৰজনাথ গোহাঁইদেৰৰ পুতেকক পুৰন্দৰ সিংহক ৰজা পাতে, ১৭৩৯ শকৰ ১১ ফাগুন।

রাজাদের লেখা চিঠির আরম্ভ সংস্কৃতে করে পরের অংশ আঞ্চলিক ভাষার গদ্যে লেখা এক প্রকার নিয়ম ছিল। তা ছাড়া চিঠির গদ্যে একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। সেটা হল, যাকে চিঠি লেখা হয়েছে সেই প্রাপকের কাছে যাতে ভাষাটি বোধগম্য হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। কোচবিহারের রাজার আহোম রাজাকে এবং আহোম রাজার কোচরাজাকে দেওয়া চিঠি-পত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বুরঞ্জীর গদ্যের একটি বৈশিষ্ট্য হল ভাবপ্রকাশের জন্য অনেক সময় ছোট-ছোট বাক্যের প্রয়োগ। দীর্ঘ বাক্য যে নেই তা নয় কিন্তু যৌগিক বাক্যের ব্যবহার ছিল না, যদিও পরবর্তীকালে বুরঞ্জীর মুদ্রিতরূপে সম্পাদক যতিচিহ্ন, ঊর্ধ্বকমা ইত্যাদির ব্যবহার করে আধুনিক পাঠকের কাছে বুরঞ্জীর অধ্যয়ন সহজেই গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। পুরনো বুরঞ্জীর পাতায় এক দাঁড়ি, দুই দাঁড়ি, কোলন চিহ্ন ইত্যাদির প্রয়োগ ছিল। যতিচিহ্নের প্রয়োগ ব্যাপকভাবে করেন মিশনারিরা।

বুরঞ্জী ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পুরনো রীতিতেও লেখা হয়েছিল। এমন-কি গদ্যের স্থানে পদ্যেও দুটি বুরঞ্জী লেখা হয়েছে। অন্যদিকে, ব্রিটিশ আসার পরে পুরন্দর সিংহের রাজসভার আধিকারিক কাশীনাথ দ্বিজ তামুলীফুকন 'আসাম বুরঞ্জী' পুঁথিতে অসমের ইন্দ্রবংশীয় মহারাজাদের বিবরণ গদ্যে দিয়েছেন। ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মণিরাম দেওয়ান 'বুরঞ্জী বিবেকরত্ন' নামে দুই খণ্ডে একটি বুরঞ্জী লেখেন। অসমে মানের তৃতীয়বার আক্রমণের সময় চারিঙ-এর রামদত্ত তাঁর পুত্র মণিরামকে নিয়ে উজান অসম থেকে সপরিবারে যোগীঘোপা, চিলমারী, বঙালকাটা ইত্যাদি স্থানে ঘোরাঘুরি করে গোয়ালপাড়ায় এসে অবস্থান করেন। এভাবে থাকার সময় রামদত্ত নবদ্বীপের একজন বাঙালি পণ্ডিতকে নিয়ে এসে মণিরামের সংস্কৃত, বাংলা এবং ফারসি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মণিরাম অসম থেকে মান চলে যাওয়ার পরে উত্তরে ফিরে আসেন। এবং ইতিমধ্যে অসমে শাসন কায়েমকারী ব্রিটিশকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এই আশায় যে, ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ঘোষণা করেছিল মান যাওয়ার পর অসম রাজ্য অসমের রাজাকে ফেরত দেবে। সে যা-ই হোক, মণিরাম নিজের অনুপ্রেরণাতেই দুই খণ্ডে অসমের একটি বুরঞ্জী লিখতে শুরু করেন এবং ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্পূর্ণ করেন। এই বুরঞ্জীটির ভাষায় অসমিয়া, সংস্কৃত, বাংলা এবং মাঝে মাঝে ফারসি শব্দের মিশ্রণ দেখা যায়। বুরঞ্জী গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর প্রথম পরিচয় অংশ সংস্কৃত, পরের অনুচ্ছেদের ভাষা বাংলা আর তৃতীয় অনুচ্ছেদে অসমিয়া ও বাংলা মেশানো ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এর পরের কয়েকটি অংশ অসমিয়া এবং একটি অংশ বাংলায় আরম্ভ করে পরে অসমিয়াতে স্বচ্ছন্দে পরিবর্তিত হয়েছে। এরকম মিশ্রণের প্রধান কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার প্রথমে প্রশাসনে অসমিয়া ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেছিলেন, যদিও ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে অপরিচিত অসমিয়াদের পক্ষে প্রশাসনিক দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে পালিত না-হওয়ায় ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কলকাতার বাঙালি কর্মচারী এনে নিযুক্ত করতে শুরু করেন। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানির ২৯ নং আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা প্রশাসন ও আদালতের ভাষারূপে প্রবর্তন করা হয়। প্রথম অবস্থায় অসমে ব্রিটিশরা অসমিয়া ভাষা ব্যবহার করলেও উল্লিখিত আইনের বলে অসমে অসমিয়া ভাষার স্থানে বাংলা ভাষা প্রবর্তন করা হল। তার কারণ, ব্রিটিশ শক্তি ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে অসম অধিকার করলেও অসমকে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে গঠন করার পরিবর্তে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত করে বঙ্গের অংশরূপে শাসন চালাতে শুরু করে। তাই আইন অনুসারে বঙ্গদেশে যেহেতু বাংলা ভাষা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবর্তিত ছিল, বঙ্গের অংশ হিসাবে অসমেও এই ভাষা প্রবর্তিত হল। এখানে সংক্ষেপে একটি বিষয় বলে রাখি। সেই সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার পটভূমিতে অসমিয়া ভাষা সম্পর্কে উচ্চ শ্রেণির অসমিয়া, ইংরেজ আধিকারিক এবং বাঙালি কর্মচারীদের মনে গেড়ে-বসা এক ভ্রান্ত ধারণার কথা বলা প্রয়োজন। শাসিত ব্যক্তিরা শাসকদের সব বিষয়ে উচ্চস্তরের বলে স্বভাবতই গণ্য করে। তাই হলিরাম

ঢেকিয়াল ফুকন, মণিরাম দেওয়ান প্রমুখের মতো অসমিয়াদের মনেও ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে জড়িত ইংরেজি এবং বাংলা ভাষা তাঁদের নিজস্ব অসমিয়া ভাষার চেয়ে উন্নত বলে ধারণা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত একই উৎস থেকে সৃষ্ট অসমিয়া ও বাংলা ভাষার মধ্যে বিদ্যমান অনেক সাদৃশ্যও ব্রিটিশ ও বাঙালিদের মধ্যে এরকম একটি ধারণার জন্ম দিল যে অসমিয়া ভাষাটি বাংলা ভাষারই একটি উপভাষা হতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, সেই সময়ের অসমের কমিশনার জেনকিন্স ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে 'ফোর্ট উইলিয়াম'-এ পাঠানো প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন অসমের সব সরকারি কার্যালয়ে একশো শতাংশ বাঙালি নিযুক্ত হওয়ার তথ্য। এরকম এক অবস্থায় অসমিয়া ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ইংরেজ ও বাঙালিদের মনে যে কোনো ধারণা ছিল না সে-কথা শুধু প্রমাণিতই হয়নি, সেইসঙ্গে অসমিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মনেও হীনম্মন্যতার সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়ের অসম ও বঙ্গের দুয়রীয়া বরুয়া (অনেক সময়ে দুয়লীয়া বরুয়াও বলা হয়) পদে থাকা হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন বাংলা ভাষায় 'আসাম বুরঞ্জী' লিখে ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম ইতিহাস। মণিরাম দেওয়ানের 'বুরঞ্জি বিবেকরত্ন'ও মিশ্রিত ভাষার প্রয়োগে নিজস্ব ভাষা-সম্পর্কে প্রায় সমতুল্য মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। তাহলেও মণিরাম দেওয়ানের ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা হয়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে গিয়েও মণিরাম অসমিয়া বিভক্তি এবং প্রত্যয়ের ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো বাক্যে গেলেন, করিলেন প্রভৃতি সমাপিকা ক্রিয়া এবং আসিয়া, বসিয়া, হইয়া ইত্যাদি অসমাপিকা বাংলা ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করলেও ডেকাহতে, পথারতে, সত্রতে, নকরতে, লওাতে, খাওতে, পাওাতে, হওয়াতে, নালরে, জানিবা, তাহান, কেঁচা প্রভৃতির ব্যবহারেও নিজস্ব ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশ রয়েছে। মণিরাম তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান হয়েছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ নাম ছিল মণিরাম দত্ত বরভাণ্ডার বরুয়া দেওয়ান।

অসমিয়া ভাষা-সম্পর্কে ঊনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালিদেরও স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। বেশিরভাগ পণ্ডিতেরই প্রাচীন অসমিয়া ভাষা সম্পর্কে জানা ছিল না এবং ঊনবিংশ শতক থেকে যখন ক্রমে ক্রমে জানতে শুরু করলেন তখন তাঁরাও অসমিয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করে এই ভাষাকে বাংলা ভাষার উপভাষা রূপেই মনে করলেন এবং এমন-কি শঙ্করদেব-মাধবদেবের রচনা সহ প্রাচীন অসমিয়া সাহিত্যকেও কোনো কোনো পণ্ডিত বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত বলে ভেবেছিলেন। তাই ব্রিটিশ আসার সঙ্গে সঙ্গে অসমিয়া ভাষাকে এক জীবন-মরণ সংকটের সম্মুখীন হতে হল।

॥ সাত ॥

অন্যান্য বিষয়ের গদ্য

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বুরঞ্জীর গদ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত আরো কয়েক প্রকারের গদ্য গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে ভূমিদানফলকে ব্যবহৃত অসমিয়া গদ্য, রাজদরবারের রায়দানের গদ্য এবং বাক্সে ভরে-রাখা জমির দলিলের গদ্যের কথা বলা যায়। বর্মন বংশের কালে ভূমিদানের তাম্রশাসনে সংস্কৃত ব্যবহৃত হয়েছিল। আহোম শাসনকালে অসমিয়া ভাষার ব্যবহার শুরু হল। অবশ্য বিভিন্ন দেবালয় ও মন্দিরে ভূমিদানকালে শাসনগুলি সংস্কৃতেই লেখা হয়েছিল। অসমিয়া ভাষায় লেখা শাসনগুলির গদ্যের নমুনা নীচে তুলে ধরা হল—

ক) বেঙেনাআটি সত্রের ভূমিদান— এতদ্বিৰৰনং ১৬৯৯ শকত বেঙেনাআটী সত্ৰৰ এই তিনিজন দেৱতাক প্ৰতি ৰাজমাঞঁদেৱৰ পুণ্যাৰ্থে ঁৰে ভূমি সমেত এই মনুষ্যসকলক উৎসৰ্গি দেৱোত্তৰ কৰি দিলে আৰু এই তাম্ৰপত্ৰো কৰিলে।
ঁৰ আড্ডা বৰবৰুৱাত কৈ ঢেকিয়াল ফুকনে মজিন্দাৰে কাকত কটোৱা মানুহ ৰায়ডঙিয়া ফুকনৰ ভাগৰ সিঙিয়া খাতৰ বেঙেনাআটীত ভোগ ৰন্ধা ব্ৰাহ্মণ মন, ভাঃ সত।

খ) হয়গ্রীব-মাধবের অখণ্ড-প্রদীপের হয়ে দেবালয়ের জমির তাম্রফলক : শ্ৰীশ্ৰীস্বৰ্গনাৰায়ণদেৱৰ শ্ৰীগৌৰীনাথসিংহ নৰেশ্বৰে ঁ৭ শ্ৰীশ্ৰীহয়গ্ৰীৱ-মাধৱৰ অখণ্ড প্ৰদীপ জলাবৰ কাৰণে ৭২৭ পুৰা দেৱালয়ৰ জমি শ্ৰীকৃষ্ণদাহ আঠপৰীয়া ও শ্ৰীমোলান ভৰালকাকতিক তাম্ৰফলি কৰি দিয়ে। এই মাটীৰ ৰূপ শ্ৰীকৃষ্ণদাহ আঠপৰীয়া শ্ৰীমোলান ভৰালকাকতি। পুত্ৰপৌত্ৰাদিক্ৰমে সাধি থাকিব। ইতি। শক ১৭১০ ৯ কাৰ্তিক।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের রাজদরবারের গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায় সেই সময়ের রাজদরবারের বিচারের রায়দানের গদ্যে। এরকম গদ্যে দীর্ঘ একটি বাক্যেই সম্পূর্ণ রায় অন্তর্ভুক্ত করতে দেখা যায়। নীচে একটি দীর্ঘ রায়ের অংশ (সমগ্র রায়টি

অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় কেবল একটি অংশ তা থেকে উদ্ধৃত করা হল)—

এতদ্বিবৰণং শ্ৰীশংকৰ দেৱৰ বটদ্ৰৱা স্থানৰ নাম ঘৰৰ মৃতিকাৰে পৰা সলগুৰীয়া শ্ৰীৰাম চৰণ আতাবে নৰো আৰ শ্ৰীৰামদেৱ আতাৰে বিবাদ জন্মিলত ঁদেৱে কুঐঞে গঞা ৰাজমন্ত্ৰী শ্ৰীপূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঞি ডাঙৰীয়াকৈ সন্দিকৈৰ শ্ৰীভদ্ৰকান্ত বৰ বৰুৱাকে সুধিব দিলত দুয়োজনা ২ দুয়ো মহন্তক সাক্ষাৎ কৰি সুধি স্থানৰ ঠাইলৈকো লম্বো দোলাখৰিয়া বডুৱাকে চাউডাঙৰ বিদ্ধ সইকিয়াকে বৰবৰুৱাৰ টেকেলা বড়া চকৰ ধৰা হেমোদৰকে পঠাই স্থানৰ সমীপৰ মহন্ত ভকত চহৰিয়া দুয়োভাগৰ কেৰলিয়া আশ্ৰমী ভকত এই সকলকো একত্ৰ কৰি দুয়োজন আতাক আগত থৈ সোধাত সেই সকলেও পূৰ্ব্বীয় ৰাজাসকলৰ সিদ্ধান্তনুসৰি স্থানৰ মাটিৰ সীমা দেখাই পদশিলা মাটি দুয়ো ভাগে সমে পাই বুলি কলত নৰোৱা আতা গাত বলৰে সজা নাম ঘৰটো সলগুৰীয়া আতাৰ ভাগৰ খুটাৰ ভিতৰত মাটি পৰিলত সোধাত নৰোআ আতা ঘাটিলত শলগুৰীয়া আতা জিকিলত ঁৰে ডাঙৰীয়া বৰুৱা সৈতে পূৰ্ব্ব সীমানাৰ দৰে মাটি ভাগ কৰি নামঘৰ দুয়োজনাৰ ভাগৰ মাটিত সাজি লবলৈ আজ্ঞা কৰি স্থানৰ মাটি খনিকো দুভাগ কৰি পদশিলাকো দুয়োভাগে ৰাখি খুটা মৰাই দি তৰে ধৰ্ম্মাৰ্থে শ্ৰীশলগুৰীয়া ৰামচৰণ আতাক স্থানৰ + ভাগৰ + মাটি ভকত খনিয়ে সৈতে তাম্ৰ পত্ৰ কৰিক দিলে দুয়ো ভাগৰ মাটিৰ সীমা পূবে কঠাল পশ্চিমে পুলি শিমলু উত্তৰে কেলিকদম্ব দক্ষিণে কঠাল...

পেড়াকাকত শব্দটির অর্থ হল বাক্সে বা তোরঙে ভরে রাখা জমির দলিল। এই বাক্স বা তোরঙে রাখা দলিলের জন্য প্রথমে সাঁচিপাত ব্যবহার করা হলেও পরে হাতে প্রস্তুত করা তুলাপাতাও (তুলোট কাগজ) ব্যবহার করা হয়েছিল। এরকম কাগজে জমি ও মানুষের হিসাব লিখে রাখা হত। তদুপরি এভাবে রাখা জমি ও মানুষের হিসাব রাখার বাইরেও মানুষ ও জমির ক্ষেত্রে হওয়া বিচারের সিদ্ধান্ত এবং আদেশ-নির্দেশও পেড়াকাকতে লেখা হয়েছিল। তা ছাড়া 'বেটি বন্দি' (দাস-দাসী) বেচাকেনার রায় প্রভৃতিও সংরক্ষিত হয়েছিল। সেরকম পেড়াকাকতের নমুনা নীচে তুলে দেওয়া হল—

স্বস্তি শ্ৰীবিষ্ণুচৰণাম্বুজ...কমলেশ্বৰ সিংহ ভূপো...কামৰূপ দেশৰ বড়ুয়া ও বড়কায়স্থ ও চৌধাৰী ও পাটোৱালী ও তালুকদাৰ ও ঠাকুৰিয়া ও গয়ৰহ সকলেও জানিব পূৰ্ব্বে বঙ্গলা আমোলত চুলতান গেয়াচদ্দিন বলবন্ত মৃত্যু হোৱা থান হাজোৰ গৰুড়াচল পৰ্ব্বতৰ ওপৰে পওমোকা মৰ্চ্চিদত এবং ৰজোৱাত চাহ জাহানৰ পুত্ৰ মহম্মদ চুজায়ে ফতিহা কৰি থাকিবাৰ জন্যে দি যোৱা মাটি মানুহ আৰু আচামি আমোল হ'লত সন্দিকৈ বৰফুকনে পৰে দৰঙ্গিৰজাই দি যোৱা মাটি মানুহ এই সকলোবোৰত অলবিন্ধ হৈছে যে শ্ৰীশ্ৰীকমলেশ্বৰ সিংহে শুনি ৰাজমন্ত্ৰি শ্ৰীবুড়া গোহাঞি ডাঙৰীয়াক বাহবৰিয়া ৰুদ্ৰ কটকীক পঠাই শ্ৰীবড়ফুকণত আজ্ঞা কোৰাই ফুকণৰে সজাতি কটকীএ মোকালৈকে গৈ মাটি মানুহ বুজ বিচাৰ কৰি আহি শ্ৰীবুড়া গোহাঞি ডাঙৰীয়াত জনালতহি শ্ৰীবুড়া গোহাঞি ডাঙৰিয়াই চুজাই দি যোৱা মহজৰ বোৰো আগলৈকে নিয়াই মজুন্দাৰ ৰডুয়াক আগত থৈ দেশি বিদেশি পাৰ্চ্চি পঢ়াৰ মুখে সেই মহজৰ বোৰ শুনি, মহজৰো জীন্ন, অক্ষৰো উৰা, ফটাচিটা জোৰাদিয়া দেখি আৰু সকলোবোৰ মাটি মানুহ পীড়ৰ নামে নোলোৱাত হাল মৌৰলুক নামে ওলোৱাত মিথিলাৰ লগত অসমৰ বহু বিষয়ত মিল আছে। অন্য প্রসঙ্গত সেই কথা উল্লেখ করা হৈছে।

॥ আট ॥

গুরু-চরিতের গদ্য

মধ্যযুগের অসমে যেভাবে বুরঞ্জী লেখার প্রথা অসমিয়া ভাষায় যোলো শতকে শুরু হয়েছিল তেমনই শ্রীমন্ত শংকরদেব, মাধবদেব প্রমুখ সন্ত তথা আতাদের জীবনচরিত লেখার প্রথাও আরম্ভ হয়েছিল। এই জীবনচরিত অবশ্য পদ্যে লেখা হয়েছিল। এরকম জীবনচরিতগুলিতে স্বাভাবিকভাবে সন্তদের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব বোঝানোর জন্য অলৌকিক কাহিনিও ছিল না এমন নয়। কেবল অসমেই নয়, বিশ্বের যে-কোনো স্থানের ধর্মগুরুদের জীবনচরিতে এরকম বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। ইংরেজিতে ব্যবহৃত Hagiography শব্দটিতে কাল্পনিক কাহিনির বিশেষত্ব ধরে রাখার জন্য একসময় এরকম চরিতপুঁথিগুলির ঐতিহাসিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু চরিতপুঁথিগুলির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ কল্প-কাহিনির আবরণ

সরিয়ে সত্য-কাহিনি তুলে ধরার ফলে এরকম গ্রন্থগুলিতে থাকা ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্ব ব্যবহারে আধুনিক কালে এখন আর কোনো বাধা নেই। সে যা-ই হোক, অসমের গুরু-চরিতগুলির অধিকাংশই হল শংকরদেব-মাধবদেব এবং আতাদের নিয়ে লেখা পুঁথি। গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হল, ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে অর্থাৎ শংকরদেবের তিরোভাবের পর থেকে শংকরদেবের তিরোধান তিথিতে নাম-কীর্তন ইত্যাদি ছাড়াও তাঁকে স্মরণ করে কোনো একজন ব্যক্তির কিছু কথা বলার দৃষ্টান্ত থেকে পরে এরকম স্মরণ একটি প্রথায় পরিণত হল। এই প্রথাকে 'চরিত-তোলা-প্রথা' বলে অভিহিত করা হত। কমলাবাড়ি সত্রে এখনও গুরু-তিথিতে প্রথা অনুযায়ী দায়িত্বে থাকা একজন ব্যক্তি শংকরদেব-মাধবদেবের জীবন-বৃত্তান্ত কথায় তুলে ধরেন। এরকম দায়িত্বশীল ভকতকে, বয়সের দিক থেকে নয়, যোগ্যতার ভিত্তিতে, 'বুঢ়া ভকত' নামে অভিহিত করা হয়। এরকম ভকত সত্রের যে 'হাটী'*-তে বুঢ়া ভকত থাকেন সেই বসার স্থানকে 'বরবহা' বলা হয় এবং এরকম বহায় গুরুচরিতের বিশেষ চর্চা হয়। কখনো আবার কোনো কোনো ভকত গুরুচর্চা করতে নিজের বসার জায়গায় (বহা) অন্য ভকতকে নিমন্ত্রণ করেও আনেন।

উল্লেখযোগ্য যে, এরকম চরিত-তোলা প্রথা মুখে মুখেই চলে আসছে। তাই বলার মানুষটি বা কথক সমস্ত গুরুচরিত যেভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন সেইভাবে কোথাও না-থেমে বলে গিয়েছেন। সেজন্য কথনশৈলীতে নিজের অভিজ্ঞতায় পাওয়া বিষয়বস্তু পরম বিশ্বাসে তুলে ধরার ফলে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গুরুচরিতে থাকা সত্রিয়া ভাষার কথনশৈলী। এই কথনশৈলীতে প্রথম পুরুষের একবচনের পরিবর্তে সর্বদা বহুবচন এবং যাঁদের সামনে কথা বলা হয় তাঁদেরও সরাসরি সম্বোধন না-করে বহুবচন ও কর্মবাচ্য প্রয়োগ করা হয়। যেমন 'আপনি ভাত খেয়েছেন কি' ('আপুনি ভাত খালেনে'), এভাবে না-বলে বলা হয়, 'আপনাদের সকলের চাল ধরা হয়েছে তো' ('আপোনাসবর চাউলমুঠি ধরা হ'লনে')। সেজন্য সত্রে একটি প্রবাদবাক্য আছে : 'আমি' নামে অহংকার, 'তুই' নামে গালি ('মই' নামে অহংকার, 'তই' নামে গালি)। গুরুচরিত কথার ভাষায় এই কথনশৈলীর স্বাদ আদ্যন্ত আছে। যতিচিহ্নের মধ্যে এক দাঁড়ি, দুই দাঁড়ি এবং কোলন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছিল।

'গুরু চরিত কথা'-য় লেখকের নাম ছিল না। এখানে নামহীন বক্তা এবং শ্রোতা থাকে। বরপেটাসত্রে থাকা 'গুরু-চরিত-কথা' গ্রন্থটি প্রথমে উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু, পরে মহেশ্বর নেওগ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। ড. মহেশ্বর নেওগ পরোক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অনুমান করেছেন, এই গ্রন্থটির বক্তা ধনঞ্জয় বৈরাগী বা চক্রপাণি বৈরাগী এবং এই কথাও অনুমান করা চলে যে হয় চক্রপাণি বৈরাগীর মুখের কথা তাঁর জীবনের শেষদিকে কেউ লিখে রেখেছিলেন, নয়তো ১৬৮০ শকে (১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) চক্রপাণি বৈরাগী আতৈর মৃত্যুর পরে চরিত পুঁথিটি সংকলিত হয়েছিল। মহেশ্বর নেওগ এরকম কথাই বলেছেন। পুঁথিটির ভাষায় থাকা আরবি, ফারসি, তুর্কি আর ইংরেজি মূলেরও কিছু শব্দ এই কথা প্রমাণ করে যে দিল্লির বাদশাহ এবং বঙ্গের নবাবের সঙ্গে অসমের যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে এইসব শব্দ অসমিয়া ভাষায় প্রবেশ করেছিল। যেমন— কাজিখত, খবরদার, খাণ্ডান, গোলা, গোলাম, চকীদার, চফারী, চাকর, চিচা, চিপাহী, জংঘল, জমিদার, টুপী, ঠাণ্ডা, থানাদার, দোকান, দর্জী ইত্যাদি ইত্যাদি। শংকরদেবের তীর্থ ভ্রমণের বিবরণ দিতে গিয়ে বাংলা, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষারও দু-একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'গুরু চরিত কথা' ছাড়াও গদ্যে লেখা 'বরদোয়া চরিত' আদি পুঁথির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে গদ্যে লেখা 'গুরু চরিত' পুঁথি যেভাবে ভক্তিধর্মের সঙ্গে জড়িত একটি বিশিষ্ট অসমিয়া সত্রিয়া গদ্যশৈলী ধরে রেখেছে সেইভাবে অসমের বুরঞ্জীগুলিও ধরে রেখেছে অসমের মান্য গদ্য শিল্পের রূপ ও স্বরূপ। নীচে গুরু চরিত কথা-র ভাষার একটি আভাস তুলে ধরা হল—

ক) পাছে সূর্য্য ভূঞাৰ দুহিতৃ আএ খুজি বাঢ়ি শুভ মাহ বাৰ তিথিত গুৰুজনৰ একৈচ বৰ্ষ আই চৈধে বৰ্ষত বিবাহ কৰালে। গুৰুজনাৰ বাইশ্য বৎসৰ ঃ আইৰ পোন্ধেৰে বৰ্ষত পুষ্পবৎসৰ হল। সান্তিৰনি কৰাই ৰতিসম্ভোগে আছে। সপ্তদশ বৰ্ষত মনুকন্যা জন্মিল ঃ ন মাহৰ অন্তে আই চলিল।। (আহিনৰ এঁদিন জাঞতে বুদবাৰেঃ ৰামচন্দ্ৰ কাথৰ বেটা হৰি জমাইত বিহা দি গৃহে থৈ গৈছেঃ) কৃয়াকৰ্ম্ম আচৰি তেৰ বৰ্ষ ৰহিঃ (কতো মুখভেদে কই তেহু বৰ্ষত আপিক

*'হাটী হল সত্রের নামঘর-মণিকূট, সত্রাধিকারের বাসস্থানের চারদিকে ভকতবৃন্দের থাকার দীর্ঘ এক-একটি ঘর। এরকম দীর্ঘ ঘরে এক-একজন ভকত থাকতে পারার মতো ভাগ-ভাগ করে এক-একটি নিজের 'বহা' (বসার) রূপে আজীবন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়।

হৰি জমাইত বিহা দি গৈছে) বিৰকত বৈৰাগ্য হৈ ঃ বাহুজন ভক্তেৰে পচিম ক্ষেত্ৰ কৰিবলৈ জাত্ৰা কৰিলে। ৰামৰাম ঃ সৰ্ব্বজাই ঃ পৰ্ম্মানন্দ ঃ বলোৰাম ঃ বলোভদ্ৰ ঃ গোবিন্দ ঃ নাৰায়ণ ঃ বৰচিৰামঃ গোপাল ঃ চোট বলোৰাম ঃ মুকুন্দ ঃ মুৰাৰি এইসৰ চাতেৰে ওলাই।।

খ) তৈতে গৰুড়পুৰাণ চাই ভকতি প্ৰদীপ কৰিলে ঃ হৰিবংশৰ পৰা ৰুক্মিণীহৰণ কৰিছে। তেহে বাহু কন্ধ কৰিবৰ মন দিলে ঃ মূল আৰ্ষা নাইকাৎ সূচক খলুৰা নিন্দে বুলি তোচা খাই আছে। তেনেতে পচিমৰ পৰা বাহু কন্ধ ভাগৱত লৈ ঃ জগদিশ মিশ্ৰ পালেহি ঃ গাএৃমুৰতে ৰাই আতাক পাই বাৰ্ত্তা সুধিলে ঃ শ্ৰীশংকৰ কৎ থাকে বহা ঃ বোলে আছে নাই ম চাই আহো ঃ তুমি খানেক তন্তা।

গ) পাচে গুৰু সুধিলে ঃ তোম্ৰা কৰপৰা অহা জাই ঃ কি শাস্ত্ৰ আৎ বিপ্ৰে বোলে বাৰানাসি তিৰুতিয়া গ্ৰামে গৃহ ঃ পঢ়িলো ব্ৰহ্মানন্দৰ ছাত্ৰসালে বাহু বৰ্ষ ঃ গুৰু নাম দিলে জগদীশ। । বাহু কন্ধ কণ্ঠোগত হৈ জগন্নাথলৈ সুনাবলৈ নিলো ঃ স্বপ্নত জগন্নাথে বোলে কিৰ আহিলা ঃ বোলো ভাগৱত সুনাবলৈ ঃ বোলে মই অন্তৰে চৈতন ঃ লোক দেখাই ঝৰভাএ আচো। দোষণ সিধান্ত কেনেকৈ দিম ঃ মই অৎ কলাহে পূন্নে শঙ্কৰ তৎহে ঃ তত্ত কলেহে আমিও পাঞ শঙ্কৰেও পাই মাতা জগন্নাথ তাৰাহে জোৰাগৈ সুধি পূব দেশে বআদি গ্ৰাম ঃ চই মাসে সুধি পাইচোহি আপুনাক।

ঘ) পাছে দশম পঢ়োতে ওলাল ঃ বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি নন্দৰ পোক।। দেখাইলা বৈকুণ্ঠ ব্ৰজৰ লোক। সুনি ভক্তে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বাৰেভূএৱা সমে ঃ গোপ গুপিক জে কৃষ্ণে দেখালে আমাৰো কৃষ্ণ তুমি (চাবৰ) ইচা গৈছে দেখোৰা জক।। তেহে ভূএৱাসবে দল কৈলে ঃ গুৰু কপিলিমুখৰ কলঙ্গকাখৰ কুমাৰত খোল গৰালে জোখা দি ডাইনা সাত আঙ্গুল বেএৱা তেৰ আঙ্গুল।। হল চালে ঃ (ঘুন দিবৰ ভূ নেপাই মাত নোলাই কষ্টপাই অসন্তোসে আছে ঘুমাই ভাত খাই পাতৰ কাকে ঠোট ঘহালে মাত ওলাল তেহে বৰা ভাতৰে খোলাগুৰি বটি দিছে ঃ) নাট সূত্ৰ মৰ্ত্তা আৰিয়া জোকৈ পাতিলে ঃ (চন্মকৈ সন্ন্যাসী ৰূপ ধৰি একৰূপ ধৰি দেখাইচেহি লোক দেখাই) তুলাপাতত সাৎ বৈকুণ্ঠ লিখিছে ঃ কল্পতৰু দিবলৈ ভ্ৰম হৈ ঠগিৎ খাইআছে। চন্দৰি আএ ধান হতাইছিল ঃ বোলে ডেকাগিৰি সেইখিতে নিদিয়া কিয় ঃ শ্ৰীমন্দিৰ কাখে সপ্তম দ্বাৰ আগ কৈ।। তেহে গুৰু দিচে ঃ পচিমে বাহুভূএৱা চাপি দৌল বান্ধি জাত্ৰা পাতিলে ঃ

॥ নয় ॥

পরিবর্তনের যুগ

ব্রিটিশ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অসমিয়া ভাষার গদ্য সপ্তম শতক থেকে গঠিত হয়ে সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও সমৃদ্ধ হয়ে একটি উন্নত বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। এই কথা সর্বদা স্মরণযোগ্য যে কোনো ভাষা এককভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে না, বিকশিত হতে পারে না। ভাষার সঙ্গে সমাজ ও সভ্যতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একটি ভাষার প্রত্যেক শব্দই তার নিজের নৃতাত্ত্বিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমির মধ্য থেকে সৃজিত হয়। সমাজ জীবনে ঘটে-যাওয়া বিভিন্ন সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতির ফলে কখনো জনসংকোচন, কখনো জনবিস্ফোরণ ঘটে। তদুপরি স্বাভাবিক অভিবাসনও এরকম বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। মানুষের সঙ্গে হওয়া সংঘাত ও সমন্বয় মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। তদুপরি সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিষয়ের সঙ্গে আসা নতুন নতুন শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি ভাষার পরিবর্তন সাধন করে। অসমিয়া ভাষা কমপক্ষেও এক হাজার বছর ধরে এরকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশপূর্ব যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে। অবশ্য এই প্রবাহ নিঃসন্দেহে সর্বাধুনিক কাল পর্যন্ত ছিল ধীর গতির। অসমিয়া ভাষা এই সময়সীমার মধ্যে তৎসম, তদ্ভব এবং দেশী শব্দভাণ্ডার ছাড়াও বাংলা, মৈথিলী, ওড়িয়া, হিন্দি, উর্দু, ফারসি, আরবি, তুর্কি, ইংরেজি এবং ইংরেজির মাধ্যমে আসা পশ্চিমের অন্যান্য ভাষার কম সংখ্যক হলেও শব্দ আহরণ করেছে এবং এই শব্দগুলি ভাষাটির মধ্যে মিশ্রিত হয়ে একে সমৃদ্ধি দান করেছে। কখনো ভাষাটি নিজের দুই-একটি শব্দের স্থানে বাইরে থেকে আসা শব্দ নিজের করে নিয়েও এরকম সমৃদ্ধি সাধন করেছে। ব্রিটিশ আসার পূর্ব পর্যন্ত অসমিয়া ভাষা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত

হয়ে এসেছিল। এই নিয়ন্ত্রণ কিছু পরিমাণে ব্রিটিশ যুগ আরম্ভ হওয়ার পরে পরিবর্তনের সম্মুখীন হলেও পুনরায় সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ইংরেজি ব্যাকরণেরও কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান নিয়ে ভাষাটি নতুন পথ খুঁজে নিল।

আধুনিক অসমিয়া ভাষা তথা গদ্যের শুরুর যুগ

কমিশনার জেনকিন্স অসমে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারি পাঠাবার কথা জানালে ব্রিটিশ প্রশাসন সেই সময়ে ব্রিটিশ মিশনারি অসমে পাঠাতে না-পেরে আমেরিকার American Board of Commissioners for Foreign Missions-কে এই বিষয়ে জানালে তারা এই বোর্ডের বার্মা মিশনের নাথান ব্রাউনকে জানায়। তিনি সম্মতি দিলেন এবং অলিভার টি. কাটারের সঙ্গে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে শদিয়ায় আসতে প্রস্তুত হলেন। তিনি বঙ্গদেশ থেকে স্থানীয় নৌকায় ব্রহ্মপুত্রের বুক দিয়ে সুদীর্ঘ চার মাস কষ্টকর যাত্রার শেষে শদিয়ার এসে পৌঁছন। তাঁদের এই ধারণা ছিল যে 'শান' ভাষা শিখলে শদিয়া থেকে তাঁদের এমন-কি চিনদেশে যেতেও সুবিধা হবে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি নৌকায় থাকার সময়েই শান ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। শদিয়া আসার পরে তাঁরা দেখলেন যে শান ভাষা কেউ বোঝে না এবং এই ভাষা শিখে চীনে যাওয়া সম্ভব নয়। তখন তাঁদের শদিয়া এবং এর আশেপাশে প্রচলিত স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষা শেখার বাইরে অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। এই কথাও জানলেন যে শদিয়া থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিম পর্যন্ত একটি ভাষাই ব্যবহৃত হয়, সেই ভাষাটির নাম অসমিয়া। মিশনারিরা অতি কম সময়ের মধ্যে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অসমিয়া ভাষা শিখে ফেললেন। নাথান ব্রাউন ভাষা শিক্ষায় খুব পারঙ্গম ছিলেন। প্রায় এক বছর পরে ডক্টর ব্রনসনও শদিয়ায় এসে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে নাথান ব্রাউন অসমিয়া ভাষা শিখে ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস নাগাদ ইংরেজি গ্রন্থ অসমিয়াতে অনুবাদে সক্ষম হলেন।

পরবর্তীকালে মিশনারিরা শদিয়া ত্যাগ করে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ দিকে আসেন এবং জয়পুরে অবস্থান করেন। ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরা শিবসাগরে মিশন স্থানান্তর করেন তাঁদের নিয়ে-আসা ছাপাখানা সহ। অন্যদিকে জেনকিন্সের পরামর্শ অনুযায়ী মাইল্স্ ব্রনসন নগাঁও যান এবং সেখানে মিশন খোলেন। শিবসাগর মিশন থেকে তাঁরা খ্রিষ্টধর্মের পুস্তিকা অসমিয়া ভাষায় লিখে প্রকাশ করা ছাড়াও অসমিয়া বুরঞ্জী পুঁথি, অসমিয়া-ইংরেজি শব্দকোষ ইত্যাদি আধুনিক গ্রন্থ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে 'অরুনোদই' নামে একটি মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। আধুনিক অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে এই পত্রিকা একটি নতুন দরজা খুলে দিল। মিশনারিরা অসমে সরকারের বাংলা ভাষা প্রবর্তন করাকে উচিত সিদ্ধান্ত বলে ভারতে পারলেন না। কারণ প্রশাসনে, আদালতে, স্কুলে এই ভাষা অসমের সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজে বুঝতে পারা এবং তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবে ভাব প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। মিশনারিরা বাংলা ভাষায় সঙ্গে অসমিয়ার পার্থক্য সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে শাসিত অসমিয়া মানুষ বাংলা ভাষা বাধ্য হয়ে শিখলেও তা শেখা ও ব্যবহার করাকে সম্মানজনক বলে ভাবতেন না। তাঁরা 'অরুনোদই' পত্রিকায় কেবল সংবাদ পরিবেশন এবং খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে যুক্ত কাহিনি আর ধর্মীয় জ্ঞান দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, বরং অসমিয়া মানুষের মনে এক ভাষিক জাতীয় চেতনা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অসমিয়া কথ্যভাষা এবং বুরঞ্জীর ভাষাকে আশ্রয় করলেও তাঁদের ভাষা নিজস্ব একটি নতুন রূপ নেয়।

উল্লেখযোগ্য যে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জেনকিন্সের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গুয়াহাটি সেমিনারির প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন একজন ব্রিটিশ মিশনারি উইলিয়াম রবিনসন। তিনিই প্রথমে Grammar of the Assamese Language নামে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় অসমিয়া ভাষার প্রথম লিখিত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। তা হলেও, অসমিয়া ভাষার মঙ্গল সাধন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না ; বরং ইচ্ছুক ইংরেজরা যাতে এই ভাষা শিখে অসমে ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে পারে তার জন্যই তিনি এই ব্যাকরণ লিখেছিলেন। রবিনসন বরং অসমে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের ঘোর সমর্থক ছিলেন। অন্যদিকে ডক্টর নাথান ব্রাউন ছিলেন অসমিয়া ভাষার শক্তিশালী সমর্থক। তিনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে Grammatical Notices of the Assamese Language নামে অসমিয়া ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণ গ্রন্থটি রচনা করেন। ভাষার বিষয়ে রবিনসনের সঙ্গে মিশনারিদের বিপরীতমুখী স্থিতি ছিল। সে যা-ই হোক, মিশনারিদের চেষ্টা অসমিয়া মানুষের মনে কেবল ভাষিক জাতীয় চেতনার সৃষ্টি করেনি, সেইসঙ্গে শিক্ষিত অসমিয়াদের অসমিয়া ভাষাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার কাজে এগিয়ে আসার ব্যাপারেও প্রেরণা জোগায়। এক্ষেত্রে

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের পুত্র আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিরাম বরুয়া এবং হেমচন্দ্র বরুয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মিশনারিদের অসমিয়া ভাষা কেমন ছিল তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুআরিতে প্রকাশিত 'অরুনোদই' সংবাদপত্রের প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যার একটি খবরের অংশ—

ক) বঙ্গাল হিন্দুস্থান দেসত ধুঁআৰ ৰথ জোতা ৰেলপদ পাতিবলৈ অনেক মানুহে নিবেদন কৰাত ইংলণ্ডত থকা বীজুক্ত কম্পানি বাহাদুৰে তাৰ উপাই কৰিবৰ নিমিত্তে এই দেসাধিপতি গবৰনৰ জেনৰেল চেৰ হেনৰি হাৰ্ডিঙ্গলৈ মেই মাহৰ ৭ তাৰিখত চিঠি লিখি দিলে। সেই কথা সিধি হলে এই দেসৰ মানুহে আন দেসি লোকৰ নিচিনা স্ৰম নোহোৱাকৈ অতি বেগেৰে অহা জোআ কৰি অনেক লাভ পাব। ইংলণ্ড আদি কৰি মানুহ থকা দুখান, গৰু মেৰ চাগ থকা দুখান, মুঠে সাতখান ৰথ একে ভাপৰ কলেৰে টানি নিয়া হৈছে।

খ) কানিয়া মানুহ এজনি মৰাৰ কথা
শিৱসাগৰ জিলাৰ কাঠপৰা গাঁৱৰ সুমথিৰি নামে এজনি বুৰি মানুহ বৰ্তমান মাহৰ ১২ তাৰিখত ম্ৰিত্যু হল। পূৰ্বে কলিতাৰ জিয়ৰি, সো নাই নামে এক আহম মানুহে তাইক নিচিলে। সেই পৈএক মৰিবৰ ৬ ৭ বছৰ মান হ'ল। পৈএক কানিয়া, ঘৈনি একেও কানি খাইচিল। সিহঁতৰ পুতেক এটা, জিএক মুজনি এতিয়ালৈকে আচে। কোনো এদিন চোৰৰ বস্তু সেই মানুহৰ ঘৰত ওলাল ; তাতে সি চোৰ দেখাব নাঅৰাত উপাই কৰিলে।

১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের 'অরুনোদই'-এর একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ :

হিন্দু ধৰমৰ বিবৰন
হিন্দু সকলে জি জি পুথি ইস্বৰে দিয়া বুলি জানে, তাক সাস্ত্ৰ বোলে। বিষ্ণুৰ অংসে অৱতাৰ হোআ জি বিয়াস, তেঁও আগৰ বেদ ভাঙ্গি ৰিগ, জুজুৰ, সাম, অথৰ্ব, এই চাৰি বেদ লিখিলে। ৰিগ বেদে কবিতাকৈ লিখা হৈছে; জুজুৰ সাধাৰন ৰূপে লিখা আচে; সামবেদ গিত ৰূপ প্ৰাৰ্থনা; অথৰ্ব বেদত অনেক মন্ত্ৰ প্ৰাৰ্থনা আচে। চাৰিবেদ সংস্কৃতেৰে লিখা হৈছে; ১১ খন পুথিত সম্পৰ্ন বেদক এজন সেনাপতি চাহাবে ব্ৰিটিস্য মুচিয়ম, অৰ্থাত আচৰিত বস্তুৰ ভঁৰালত দিলে।
তাত বাজে উপবেদ নামেৰে আৰু চাৰিখন পুথি আচে, সেই বিলাকৰ নাম আয়ুৰ, ধনু, গন্ধৰ্ব, ডণ্ড নিতি। তাত বৈদ্য, গানিকা, নাচনি, ৰন কৰা, মন্দিৰ সজা, এই সকলো বিদ্যা লিখা আচে।

'অরুনোদই'-এর ভাষাকে যদিও হেমচন্দ্র গোস্বামী 'ভালো করে কথা না-ফোটা দুগ্ধপোষ্য ছেলের কথায় যেমন একটি মনোমোহা শ্রুতিমধুর ভাব আছে' ("ভালকৈ মাত নুফুটা কেঁচুৱা লৰাৰ মাতত যেনে এটা মনোমোহা শুৱলা ভাব আছে") সেইরকম ভাব থাকার কথা বলেছেন এবং এই ভাষাকে 'খ্রিষ্টিয়ানী অসমীয়া' ভাষা বলেছেন, তথাপি দেখা যায় যে মিশনারিরা অসমিয়া ভাষাটির মূল রক্ষা করেও নতুন শব্দ-সম্ভার, যৌগিক বাক্য গঠনের রীতি, আধুনিক যতিচিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নতুন রূপ দিতে যথেষ্ট অবদান জুগিয়েছেন। অক্ষর যোগ করার ক্ষেত্রে তাঁরা উজান অসমের কথ্য ভাষার উচ্চারণ অনুসরণ করেছেন এবং সংস্কৃত ভাষার ণত্ববিধি, ষত্ববিধি, সন্ধি, সমাস ইত্যাদির ব্যবহার করেননি। হেমচন্দ্র গোস্বামী বলেছেন, তাঁরা অসমিয়া ভাষার শব্দ-সম্ভার সমৃদ্ধ করা ছাড়া যেসব পুরনো শ্রুতিমধুর শব্দ অব্যবহৃত হতে বসেছে সেই শব্দগুলির সামান্য সংস্কার সাধন করে ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁরা আমাদের ভাষাকে একটি সুর শিখিয়ে গেলেন। এই সুরটি পূর্বে অসমিয়া ভাষায় জানা ছিল না; ভারতবর্ষের কোনো ভাষারই জানা ছিল না— সেটা ইংরেজি সাহিত্যের নিজস্ব সম্পত্তি... এই সুরের তন্ত্রী ভারতবর্ষীয় সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা দুয়ের মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধার মতো হয়েছে।' ("তেঁওবিলাকে আমাৰ ভাষাক এটা সুৰ শিকাই গ'ল। এই সুৰটি আগেয়ে অসমীয়া ভাষাই নাজানিছিল; ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ভাষাই নাজানিছিল— সি ইংৰাজী সাহিত্যৰ নিজা সম্পত্তি...এই সুৰৰ তাঁৰডালি ভাৰতবৰ্ষীয় সভ্যতা আৰু পাশ্চাত্য সভ্যতা দুইৰো মাজত লগুণ গাঁঠিৰ নিচিনা হৈছে।")

'অরুনোদই'-এর পৃষ্ঠায় খ্রিষ্টান লেখক, অখ্রিষ্টান লেখক দুই শিবিরই স্থান লাভ করেছিল। মিশনারিদের উদ্যোগে অসমিয়া ভাষা তথা গদ্য সাহিত্যের ভাব, বিষয় ও রূপের পরিবর্তন

আরম্ভ হয়েছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তা হলেও দেখা যায় যে সামাজিক, নৈতিক, ব্যাবহারিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল বিষয়ে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অসমিয়া খ্রিষ্টান লেখকেরা আকৃষ্ট হলেও ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং ভাষার অক্ষরবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিজস্ব ঐতিহ্য ও পরম্পরার প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের 'অসমীয়া ল'রার মিত্র' গ্রন্থে পাশ্চাত্য নৈতিক এবং ব্যাবহারিক বিষয়ের প্রতি থাকা তাঁর আকর্ষণ বিষয়-নির্বাচনে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির বেশিরভাগ পাঠই ইংরেজি থেকে নেওয়া। কিন্তু এর পূর্বে প্রকাশিত অসমিয়া লেখকের প্রথম মুদ্রিত পুঁথি 'আসাম বুরঞ্জী'-তে সেভাবে 'বিলাতী সুরটো' নাই, আনন্দরামের ভাষায়ও সেই বিলাতি সুর নাই। আনন্দরামের 'অসমীয়া ল'রার মিত্র'-এর 'পাঠকের প্রতি নিবেদন' এই শিরোনামে লেখা প্রথম পাঠটি থেকে কয়েকটি বাক্য তুলে দেওয়া হচ্ছে---

> "বিদ্যা সকলো সদগুণৰে মূল, তাৰ পৰা মনুষ্যৰ ইহ কালত আৰু পৰ কালতো অসীম উপকাৰ হয়, বিদ্যাৱন্ত মানুহ নির্ধনী হলেও তেওঁক সকলোৱে মন সৎকাৰ কৰে, কিন্তু ধনৱন্ত মূর্খে জ্ঞানীৰ সমাজলৈ গলে তাক কেৱে নুসুধি পণ্ডিতকহে আদৰ কৰিব। বিদ্যাৰ দ্বাৰা মনুষ্যৰ মন পোহৰ হয়, কিয়নো নানা শাস্ত্র পঢ়িলে নানা কথা জনা জায়, বিদ্যা জানিলে এই পৃথিৱী কেনে ইয়াত কি আচে আৰু আকাশ নক্ষত্র প্রভৃতি নো কেনে এইসকল সুন্দৰে জানি, কিন্তু যাৰ বিদ্যা নাই সি এইসকল একোকে নেজানে আৰু তাৰ মন গোটেই এন্ধাৰ হৈ থাকে।"

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের গদ্যের মধ্যে অসমিয়া ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রূপবিন্যাস দেখা যায়। তদুপরি, অক্ষর-রচনার ক্ষেত্রেও বরং সংস্কৃত ব্যাকরণ নিয়ন্ত্রিত অসমিয়া ভাষার কথিত শিষ্ট রূপটি ফুটে উঠেছে। তিনি যে মিশনারিদের উদ্যোগে অসমিয়া ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধের একজন অগ্রণী সৈনিক ছিলেন সে-বিষয়ে তিনি মোফাট মিল্‌সকে পাঠানো প্রতিবেদন এবং বাংলা ভাষা থেকে অসমিয়া ভাষার পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য দেখিয়ে রচিত 'অসমীয়া ভাষা বিষয়ক' গ্রন্থটি তার সাক্ষী। 'অরুনোদই'-এর পৃষ্ঠায় একটি অসমিয়া অভিধান রচনার নমুনাও তুলে ধরেছিলেন। একপ্রকার বলতে গেলে, ২৯ বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগকারী আনন্দরামই ছিলেন আধুনিক অসমিয়া ভাষার সর্বপ্রথম অসমিয়া গদ্যলেখক।

॥ দশ ॥

আধুনিক অসমিয়া গদ্যের সবল প্রতিষ্ঠা"

আধুনিক অসমিয়া ভাষায় প্রথম খ্রিষ্টীয় ত্রিমূর্তি ছিলেন ডক্টর নাথান ব্রাউন, ডক্টর মাইল্‌স ব্রনসন এবং অলিভার টি. কাটার; অসমিয়া 'ত্রিমূর্তি' ছিলেন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিরাম বরুয়া এবং হেমচন্দ্র বরুয়া। এই তিনজনই আধুনিক মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। প্রথম দুজন কলকাতায় শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু হেমচন্দ্র বরুয়া বাড়িতেই সংস্কৃত, আদালতে কাজ করতে গিয়ে বাংলা এবং অভিভাবকদের না-জানিয়ে (সে-সময়ে ইংরেজি শিখলে জাত যায় বলে এক ধারণা নৈষ্ঠিকদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল) গোপনে ইংরেজি ভাষা শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি অসমিয়া, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি এই চারটি ভাষাতেই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, রবিনসন ও ব্রাউন ইংরেজি ভাষায় অসমিয়া ভাষার ব্যাকরণ লিখছিলেন। হেমচন্দ্র বরুয়া ব্রাউনের ব্যাকরণ রচনার এগারো বছর পরে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে অসমিয়া ভাষায় সর্বপ্রথম অসমিয়া ব্যাকরণ লিখে প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্য যে হেমচন্দ্র বরুয়ার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে লেখা। এই ব্যাকরণের প্রভাব মিশনারিদের উপরেও পড়েছিল। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে 'অরুনোদই' শব্দের অক্ষরবিন্যাস নামপৃষ্ঠাতে পরিবর্তিত হয়ে 'অরুনোদয়' হয়েছিল। এই কথাও স্মরণীয় যে মাইল্‌স ব্রনসনের রচিত অসমিয়া ভাষার প্রথম অভিধানটি ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হেমচন্দ্র বরুয়ার 'হেমকোষ' প্রকাশ পায় তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পরে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে। আধুনিক অসমিয়া ভাষার গদ্য রূপের বিবর্তনে হেমচন্দ্র বরুয়ার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মিশনারিদের গদ্যরীতি এবং অক্ষরবিন্যাস নীতি সমর্থন করেননি। বরং প্রথম অসমিয়া খ্রিষ্টান নিধিরাম লিবাই ফারওয়েল মিশনারিদের অক্ষরবিন্যাস নীতি থেকে বিন্দুমাত্র সরে না-আসায় হেমচন্দ্র বরুয়া তাঁর 'আত্মজীবন চরিত' শীর্ষক ছোট রচনাটিতে নিধিরাম লিবাই ফারওয়েল সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন। ভাষার ক্ষেত্রে গুণাভিরাম বরুয়া কিছুটা অংশে নম্র হলেও হেমচন্দ্র বরুয়া ছিলেন এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নীতিনিষ্ঠ। নীচে এই দুইজনের গদ্যের এক-একটি ছোট অংশ তুলে ধরা হল। প্রথমে গুণাভিরাম বরুয়ার

লেখা :

ক) আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীত খেল বন্ধণীয়া মতে খেলৰ বান্ধণীএ ৰান্ধিলে সকলোএ খায় নতুবা আন প্ৰকাৰে হ'লে অনেক লোকে এক লাগে খোৱাৰ নিয়ম নাই। সকলোৰে হাতে সকলো বস্তু খোৱাৰ নিয়ম নাই। কাৰো কটা তামোল, কাৰো ধোৱা মাছ চাউল কাৰো কেঁচা জলপান কাৰো কোমল চাউল, কাৰো চীড়া পীঠা কাৰো পৰমান্ন কাৰো ভাত খোৱা যায়। সম্পৰ্ক, আচাৰ, নীতি, ঘণিষ্টতা বিবেচনাৰ মতে খোৱাৰ এইৰূপ তাৰতম্য হয়। আমাৰ মানুহে সাধাৰণতঃ ভাত খোৱাৰ পূৰ্বে স্নান কৰে। কোনোএ আকৌ চীড়া পীঠা বা কোমল চাউল খোৱাৰ পূৰ্ব্বেও স্নান কৰে।

দেখা যায় গুণাভিরাম বরুয়া (১৮৩৪-১৮৯৪)-র গদ্যে আধুনিক অসমিয়া ভাষার যে-প্রবাহ ছিল সেখানে হেমচন্দ্র বরুয়ার ব্যাকরণের নিয়মে দেওয়া গুরুত্বের চেয়ে ভিতরের স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতি অধিক গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। তদুপরি বাংলা ভাষার দু-একটি শব্দ, যেমন এবং, ও যেভাবে পাওয়া যায় সেভাবে বুরঞ্জীর দু-একটি শব্দের ব্যবহারও পাওয়া যায়। বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসা এবং অন্যদিকে অসম বুরঞ্জী পাঠের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এ দুটিই এরকম বৈশিষ্ট্যের কারণ ছিল বলে ধরতে পারি। উল্লেখযোগ্য, তিনি একদিকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণকারী প্রথম অসমিয়া। বাংলা ভাষার প্রভাব থেকে অসমিয়া ভাষাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রেও তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন।

গুণাভিরাম বরুয়ার সমসাময়িক হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫-১৮৯৮) ছিলেন আধুনিক অসমিয়া গদ্যের এবং সমাজের প্রধান অভিভাবকস্বরূপ। গুণাভিরাম ও হেমচন্দ্র যেভাবে অসমিয়া ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেইভাবে অসমিয়া সমাজের সংস্কারও চেয়েছিলেন। গুণাভিরাম যেভাবে বিধবা বিবাহের সমর্থন করেছিলেন হেমচন্দ্রও ঠিক সেইভাবেই সমর্থন করেছিলেন। গুণাভিরাম নিজেও বিধবা বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর লেখা 'রাম-নবমী' নাটকে (১৮৫৭) বিধবা বিবাহ সমর্থন না-করলে সম্ভাব্য বেদনাদায়ক ঘটনার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। হেমচন্দ্র বরুয়া, স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ করার অধিকার না-থাকার প্রথার বিরোধিতা করে পত্নীর মৃত্যু হলে স্বামীরও দ্বিতীয়বার বিবাহ করা উচিত নয় বলে ভেবেছিলেন, এবং সেইজন্য তিনি পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে সম্মত হননি। গুণাভিরামের মতো তিনিও 'কানীয়ার কীর্তন' এবং 'বাহিরে রং চং ভিতরে কোবা ভাতুরি' গ্রন্থ দুটিতে অসমিয়া সমাজ-জীবনের দোষ-ত্রুটিকে কঠোরভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি আধুনিক অসমিয়া ভাষায় কঠোর ব্যঙ্গ রীতিরও প্রবর্তক। হেমচন্দ্র বরুয়ার গদ্য একদিকে যেভাবে সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত, অন্যদিকে তেমনই সুনিয়ন্ত্রিত ও যুক্তিপূর্ণ। যেমন—

খ) সকলোকে মিঠা মুখেৰে মাতিব লাগে। কৰ্কশ মাত কেৰে ভাল নেপায়; মিঠা কথা হলে সকলোকে বশ কৰে। আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ কি সমনীয়া মানুহৰ কথাকে নকওঁ, আমাতকৈ নীহ মানুহকো সাদৰেৰে কথা কোৱাত একো হানি নহয়, বৰং তাৰ বাবে আমি প্ৰশংসা হে পাওঁহক। কিন্তু বৰ ডাঙ্গৰ লোকৰো আনক কটুকথা কোৱা অভ্যাস হলে তেওঁ আটাইৰে অপ্ৰিয় হয়। সকলো মানুহ একে জাতিৰ জীৱ, কেৱল কোনো বিশেষ কাৰণৰ নিমিত্তে অৱস্থাৰ হীন-ডেঢ়ি হয়, এই মাত্ৰ প্ৰভেদ; এতেকে যি যেনে অৱস্থাৰ মানুহ, তেওঁক তেনে অৱস্থাৰ উপযুক্ত সম্বোধন কৰি মতাটো, ভদ্ৰতা আৰু সুশিক্ষাৰ চিন; কিন্তু হুঁটা মাতে, যাৰ প্ৰতি সেই মাত প্ৰয়োগ কৰা যায়, সেই মাতে তেওঁৰ অসন্তোষ জন্মাইয়ে নেথাকে যি সেই মাতৰ ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰো নীচতা আৰু শিক্ষাৰ অভাৱ দেখায়।

দেখা যায়, হেমচন্দ্র বরুয়ার হাতেই অসমিয়া ভাষার গদ্য আধুনিক, স্থির ও সুদৃঢ় রূপটি লাভ করে। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে অসমের স্কুল ও আদালতে অসমিয়া ভাষা পুনঃপ্রবর্তিত হলে সে-সময়ের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের আদেশ অনুযায়ী অসমের স্কুলের জন্য অসমিয়া ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে অসমের প্রশাসন আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এবং সেই সূত্রে অসমের দশজন ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ প্রথম বাছাই পর্বে ওঠে। এই দশজনের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন হেমচন্দ্র বরুয়া। তাঁর 'আদিপাঠ' নামের পুথিটি অর্জন করে পাঁচশো টাকার প্রথম পুরস্কার। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের 'অসমীয়া ল'রার মিত্র' এবং হেমচন্দ্র বরুয়ার 'আদি পাঠ' ও 'পাঠমালা' গ্রন্থ সেই সময়ে অসমিয়া পাঠ্যপুস্তকের

অভাব পূরণ করে।

উল্লেখযোগ্য যে এই প্রতিযোগিতায় কয়েকজন বাঙালি এবং আমেরিকান মিশনারি লেখকও যোগদান করেছিলেন। অব্যবহিত পরবর্তীকালে ব্রজপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণানন্দ সেন প্রমুখ বাঙালি লেখকের লিখিত পুস্তকও ঊনবিংশ শতকের মধ্যে পাঠ্য হিসাবে মনোনীত হয়েছিল।

হেমচন্দ্র বরুয়া 'আসাম নিউজ' নামে একটি দ্বি-ভাষিক সংবাদপত্র সম্পাদনা করেছিলেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সেই সময়ে বাংলা মাধ্যম স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি পরে আত্মজীবনী 'মোর জীবন সোঁৱৰণ'-এ লিখেছেন যে আসাম নিউজ পড়ে তাঁরা অসমিয়া আধুনিক ভাষা শুদ্ধভাবে বলতে ও লিখতে শিখেছিলেন। অসমিয়া ভাষার এবং অসমিয়া গদ্যের নতুন প্রবাহ এভাবেই আরম্ভ হল। বেজবরুয়া বলেছেন যে মাতৃভাষার উন্নতি জাতীয় উন্নতির মঙ্গলময় মন্দিরের সিংহদুয়ার স্বরূপ। প্রায় ৩৬ বছর ধরে অসমিয়া ভাষা বিদ্যালয়, আদালত তথা প্রশাসন থেকে অপসারিত হয়ে থাকার ফলে ভাষাটির অগ্রগতি যে ব্যাহত হয়েছিল সে-সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। অসমিয়া গদ্য ঊনবিংশ শতকের শেষের এক-তৃতীয়াংশ সময় থাকতেই পুনরায় নিজের আধুনিক কালের যাত্রা আরম্ভ করার জন্য সরকারি অনুমোদন লাভ করে।

ভাষার সঙ্গে একটি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক তথা ব্যাবহারিক জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে থাকে। সভ্যতার বিকাশ তথা পরিবর্তনই সমাজের পরিবর্তন সাধন করে। নতুন ভাব, বিষয়, শব্দ-সম্ভার একটি ভাষায় স্বাভাবিকভাবেই প্রবেশ করে। তাই কোনো জীবন্ত ভাষাই স্থির হয়ে থাকতে পারে না। অসমিয়া ভাষার ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের এই ধারা স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখা যায়। গদ্য সাহিত্যের মধ্যে এই পরিবর্তনের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত অসমিয়াদের যাতায়াত শুরু হয়। তার প্রায় অর্ধেক শতাব্দকাল পূর্ব থেকে প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বঙ্গদেশ আধুনিক যুগে পা রাখে। বাংলা লিখিত গদ্যের জন্ম এবং বিকাশ এক প্রকার বলতে গেলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতেই শুরু হয়। জন্ম নিয়েই বাংলা গদ্য আধুনিকতার স্পর্শ পায়। তদুপরি বাংলা গদ্য তৎসম এবং তদ্ভব শব্দসম্ভারের ভিত্তিভূমিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল। অসমিয়া গদ্যের জন্ম পঞ্চদশ শতকে হলেও ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধেই আধুনিক যুগে এই গদ্য সবেমাত্র পা রাখে। কিন্তু এর যেটা আধার তা হল প্রধানত উজান অসমের কথ্য ভাষা, সংস্কৃত ভাষা এবং বুরঞ্জীর ভাষার একটি সংমিশ্রিত সুদৃঢ় আশ্রয়। ফারসি, হিন্দি, উর্দু, তুর্কি এবং মাঝে মাঝে পশ্চিমের ভাষার সংস্পর্শে এসে অসমিয়া ভাষা তথা গদ্য নতুন কিছু শব্দ আহরণ করলেও সেগুলির সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু ব্রিটিশ অসম অধিকার পরার পর ফারসি, বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার প্রয়োগের ফলে অসমিয়া ভাষা অনেক নতুন শব্দ আর প্রকাশভঙ্গি সংগ্রহ করেছিল। বিশেষভাবে ফারসি ও ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ ভাষাটিকে একটি নতুন মাত্রা দান করে। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে প্রশাসন ও আদালতে বাংলা মিশ্রিত ফারসিই ব্যবহৃত হত। নবাবের রাজত্বকালে প্রবর্তিত ফারসি জানা মানুষের সংখ্যা প্রশাসনে ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করায় প্রশাসনিক ভাষা বাংলা-মিশ্রিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পদ ও বিষয় বোঝানোর মূল শব্দগুলি ছিল ফারসি। অসমের প্রশাসন ও আদালতে নিয়োজিত বাঙালি কর্মচারীরা বাংলা ভাষার সঙ্গে সেরকম ফারসি শব্দগুলি অনায়াসে ব্যবহার করে যাওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই এইসব শব্দের ব্যবহার শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে অসমিয়া ভাষায় মিশে যায়। আদালত, হাকিম, হুকুম, দলিল, দস্তাবেজ, উকিল, মুন্সিফ, পিয়াদা, কাগজ, কলম, দোয়াত, চিয়াঁহী, কিতাপ, ফরমান, তহবিল, তলব, বাবুর্চী, খানা, খানচামা, চকী, মেজ ইত্যাদি অজস্র শব্দ যেভাবে প্রবেশ করেছে সেইভাবে টেবুল, বেঞ্চ, চামন, অর্ডার প্রভৃতি ইংরেজি শব্দও আদালতের মাধ্যমে প্রবেশ করে। শিক্ষা, যানবাহন, যাতায়াত প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শব্দ ধীরে ধীরে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে অনেক ইংরেজি ও পশ্চিমের শব্দ প্রবেশ করল। এমন-কি বাড়িতে ব্যবহারের নতুন জিনিসপত্রগুলিও নিজের নিজের এক-একটি নাম নিয়ে এল। এই নতুন শব্দ-সম্ভার অসমিয়া ভাষায় লিখিত এবং কথিতরূপে স্থান গ্রহণ করল। অসমিয়া শব্দ-সম্ভার নতুন করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া অসমিয়া সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে "জাতীয় সাহিত্যৰ লগত জাতীয় জীৱনৰ সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী...জাতীয় জীৱনৰ উন্নতি, অৱনতিত জাতীয় সাহিত্যৰ উন্নতি অৱনতি অনিবাৰ্য।"

অসমিয়া ভাষা ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে নতুন

গতিশক্তি লাভ করে। এর মূলে রয়েছে উচ্চ-শিক্ষার্থে কলকাতায় যাওয়া অসমিয়া ছাত্রদের উৎসাহ ও উদ্যোগ। বঙ্গের নবজাগরণ এবং আধুনিক বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ দেখে তাঁরা সে-সময়ের অসমের ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ এবং সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য যে অনেক করণীয় কাজ আছে সে-কথা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা প্রবাসী অসমিয়া ছাত্ররা 'অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা' (অ. ভা. উ. সা. সভা) নাম দিয়ে গঠন করা সভা থেকে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাস থেকে 'জোনাকী' নাম দিয়ে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এই পত্রিকা অসমিয়া ভাষার লিখিত আধুনিক রূপটির প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। 'জোনাকী'র ভাষা তথা গদ্য হেমচন্দ্র বরুয়ার ব্যাকরণ ও অভিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভাষা তথা গদ্য।

'জোনাকী'তে প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যায় 'আত্মকথা' শিরোনামে লেখা সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল—

> "ভাষালৈ আমাৰ বিশেষ চকু থাকিব। অসমৰ আটাই শ্রেণীৰ মানুহে যেন আমাক মৰম কৰে তালৈ আমি যত্ন কৰিম। নকৈ উঠি অহা অসমৰ নিমিত্তে আমাৰ আটাই শক্তি ব্যয় কৰিম। এই পাছপৰি থকা আন্ধাৰ দেশলৈ অলপ 'জোনাক' সুমুৱাব নোৱাৰিলেও, যদি নিজে নিজেও যত্নৰ ফিৰিঙ্গতিৰ পোহৰত বাট পাওঁ, তেনে আমাৰ শক্তিৰ মিছা ব্যয় হোৱা নাই বুলি ভাবিম। আমি জানো আমাৰ দেশ শিক্ষাত পাছ, জ্ঞানত ভিখাৰী, ধনত দুখীয়া, সংখ্যাবলত শক্তিহীন, স্বাস্থ্যত ৰুগীয়া, কামত এলেহুৱা ও পৰাধীন— কিন্তু আমি নিজ শক্তি অনুযায়ী হৈহে কামত হাত দিব পাৰোঁ। আমি যুঁজিবলৈ ওলাইছো 'আন্ধাৰৰ' বিপক্ষে ঃ উদ্দেশ্য দেশৰ উন্নতি, 'জোনাক'।"

'জোনাকী' অসমিয়া ভাষা তথা গদ্যের যে-আকৃতি হেমচন্দ্র বরুয়ার ব্যাকরণের ভিত্তিতে গ্রহণ করল সেই রূপই আধুনিক অসমিয়া ভাষার প্রকৃষ্ট ভিত্তিরূপে রূপান্তরিত হল। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া, রজনীকান্ত বরদলৈ, বেণুধর রাজখোয়া, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, মফিজুদ্দিন আহমদ হাজরিকা, আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা এঁদের হাতে অসমিয়া গদ্য যে-রূপ নিল তার নায়ক ছিলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। 'জোনাকী'-র আরম্ভ করা ভাষার রূপ এবং সাহিত্যের রোমান্টিক চরিত্র এই দুটির উপরে বেজবরুয়ার অধিকার ছিল সবচেয়ে বেশি প্রবল। সেইজন্য ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বেজবরুয়ার মৃত্যুর কিছুকাল পর পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাধিক বছরের এই যুগটিকে 'বেজবরুয়ার যুগ' বলেও অভিহিত করা হয়। বেজবরুয়া বিষয় অনুযায়ী ভাষাকে ওজঃগুণসম্পন্ন, মাধুর্যগুণসম্পন্ন ও প্রসাদগুণসম্পন্ন করে অনায়াসে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি যেভাবে ভাব ও বিষয়ের প্রয়োজন অনুসারে ভারতীয় বা বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সেইভাবে সম্পূর্ণ গ্রামীণ শব্দও স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। হাস্যরসকে তাঁর ভাষা করে তুলেছিল সহনীয় এবং গ্রহণীয়ও। তাঁর গদ্যের দুটি উদাহরণ—

ক) ঈশ্বৰে পৃথিৱীখন সকলোকে জোৰাকৈ ইমান ডাঙৰ-দীঘল, আহল-বহল কৰি দিছে যে ভাই-ভাইৰ ভিতৰত চুলিয়াচুলি নকৰাকৈও স্বচ্ছন্দে নিজকে ভালকৈ মানুহমুৱা হৈ তাক ভোগদখল কৰি থাকিব পাৰি। এটাৰ গাত লয় নগ'লেও এটাই এটাক গিলি নথ'লে একতা স্থাপনত কোনো বিঘিনি নহয়। দুই ভাই বঙলা আৰু অসমীয়াই কটাকটি, মৰামৰি নকৰাকৈ বন্ধুভাৱে এই বহল সংসাৰত ডাঙৰ-দীঘল হৈ চলিব পাৰে। এটাক জীয়াই ৰাখিবলৈ আনটোক ধৰিবৰ আৱশ্যক নাই।

খ) উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র আৰু গীতা এই তিনি ভাগ গ্রন্থক যে আমাৰ শাস্ত্রত প্রস্থানত্রয় বোলা হয় ইয়াৰ ভাবাৰ্থ এনে অনুমান হয় যে মূল হিন্দুশাস্ত্রৰ ভিতৰত এই তিনিটি ভাগ প্রকৃত ঈশ্বৰ প্রতিবাদক আৰু ঈশ্বৰ সাধনসমূলক আৰু সেইদেখি এই তিনিটিৰ শিক্ষা আশ্রয় কৰি জীৱই নির্ভয়ে ইহলোকৰ পৰা অনন্তলোকলৈ প্রস্থান কৰিব পাৰে। ব্রহ্মসূত্রৰ বিশদ ব্যাখ্যা উপনিষদবিলাকতো পোৱা যায় আৰু গীতা উপনিষদৰ সাৰ। এই নিমিত্তে গীতাক প্রস্থানত্রয়ৰ সাৰ বুলিব পাৰে। সচৰাচৰ কোৱা হয় যে সহস্র নামৰ নাম, ভাগৱতৰ সৎসঙ্গ আৰু গীতাৰ একশৰণ, এই লৈয়ে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম। (তত্বকথা)

বেজবরুয়ার কৃপাবর বরবরুয়া নামে লেখা রচনায় হাস্যরসের স্ফুরণ ঘটেছে। কৃপাবরের 'মোর জন্ম রহস্য' থেকে কয়েকটি

বাক্য তুলে দেওয়া হল—

"ঘুনুক-ঘানাক শুনো বোলে মোৰ যশযয্যাৰ কাকতীফৰিঙে শদিয়াৰ পৰা মানাহলৈকে, ভোটৰ পৰ্বতৰ পৰা নগা পৰ্বতলৈকে জুৰি, আনবিলাক অসমীয়া ভাইৰ অসমীয়া খ্যাতিৰ থোক এডালো, নোখোৱাকৈ উপান্ত কৰিলে। হেনো মোৰ সদ্‌নামৰ কুম্ভকৰ্ণই আঁ কৰিলে কি, লাখে লাখে, জাকে জাকে, অসমৰ গুণ-যশৰ ভালুক-বান্দৰ মুখৰ ভিতৰলৈ সোমাল কি। হেনো দিহিঙৰ পাৰৰ জাম্বৱন্ত, দিখৌৰ কাষৰ ডেকা হনুমন্ত, লুইতৰ দাঁতিৰ মলুৱা সুষেণ, কলঙৰ কাণৰ পেটাল বিভীষণ, পূবৰ নল, পশ্চিমৰ নীলকে প্ৰমুখ্য কৰি যত যি অংগদ সুগ্ৰীৱ আছিল মানে, সকলো খিনি সসৈন্যে নিজ দলবল লৈ এই মুখগহ্বৰত প্ৰৱেশ কৰিলে।"

এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে লেখকের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের উপর রচনারীতির স্বাভাবিক প্রভাব পড়ে। একটি যুগের বিভিন্ন লেখকের ব্যক্তিগত রচনারীতির পার্থক্য সর্বদা ঘটে থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক লেখকের রচনাশৈলী তাঁর লেখার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসমন্বিত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এই রচনাশৈলী বা স্টাইল লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও শৈলীর পরিচায়ক। এরকম পার্থক্যকে আমরা কোনো একটি ভাষার গদ্যের সাধারণ পরিবর্তন বলতে পারি না। পরিবর্তন বা বিবর্তন আমরা তখনই বলতে পারি যখন একটি ভাষার একটি যুগে রূপ নেওয়া গদ্যরীতিতে শব্দের প্রয়োগ, বাক্যের গঠন বা বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্রোত পরিবর্তন করতে আরম্ভ করে।

বিংশ শতকের অসমিয়া গদ্যকে হেমচন্দ্র বরুয়া এবং সত্যনাথ বরার ব্যাকরণ আর বেজবরুয়ার গদ্যের আদর্শ অগ্রগতির দিকে নিয়ে এসেছিল। লেখকভেদে গদ্যরীতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও গদ্যের মূল গঠন সদৃশ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, বেজবরুয়ার গদ্য পল্লবিত, পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়ার গদ্য নিয়ন্ত্রিত। সত্যনাথ বরার গদ্য ছোট ছোট বাক্যের অর্থবোধক গদ্য। এরকমভাবে প্রত্যেক লেখকের গদ্যশৈলীর পার্থক্য থাকলেও বিশ শতকের গদ্যের মূল প্রবাহটি ইতিপূর্বে যেমন বলেছি সেইরকম মৌলিকভাবে সদৃশ আকৃতির। কেবল অসমিয়া গদ্যে নিম্নের রূপটির বাইরের আকৃতির কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু সেরকম গদ্যের তুলনামূলকভাবে কম শব্দ বা প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতাই পরিবর্তনের সূচনা করে না। বরং একে অসমিয়া গদ্যের আঞ্চলিক একটি ধরন বলতে পারি।

অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর গদ্যে থাকা ওজঃগুণ অসমিয়া গদ্যকে একটি নতুন মাত্রা দিয়ে গেছে। যেমন—

"উক্ত সকলোবিলাক অন্তৰায়ৰ আঘাত যিজন পুৰুষে অপৰাজেয় শক্তিৰে বুকু পাতি লৈ জয় কৰি ধৰ্ম-কৰ্ম-সমাজ ক্ষেত্ৰত মূক নিষ্পেষিত জনগণৰ বাবে সমানাধিকাৰৰ মুক্তিদ্বাৰ খুলি দিলে, সেইজন পুৰুষৰ বিপ্লৱী ব্যক্তিত্ব আৰু অৱদানৰ বিশেষত্ব নিশ্চয় আছে,— আৰু সেইজন পুৰুষক মানৱীয় আদি অধিকাৰ-আকাঙ্ক্ষীসকলে জগদ্‌গুৰু, জয়গুৰু অৱতাৰী মহাপুৰুষ আদি আখ্যাৰে ভক্তিসেৱা কৰাটোত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। তাৰো কিছু আগৰপৰাই, স্থানীয় ভাষাক আশ্ৰয় কৰি গীত-পদ, নৃত্য-বাদ্য, ভাওনা-সবাহ আদিৰ ভিতৰেদি একো পৰিকল্পনাহীনভাৱে স্বতঃস্ফুট সহাৰি এটাৰ আভাস কিছু পোৱা গৈছিল যদিও, তাত জাতি গঠন সংস্থানৰ একো ইঙ্গিত নাছিল। সেইবাবে, জাতি সংগঠক শ্ৰীমন্ত শংকৰসূৰ্য্যৰ উদয়ত তেৰাক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি ঘূৰি সেইসকলে অসমীয়াৰ জাতীয় সৌৰজগত সৃষ্টি কৰিলে।"

বাণীকান্ত কাকতি অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যের সম্পর্কে শংকরদেব ও লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করে গেছেন। ডিম্বেশ্বর নেওগ প্রমুখ প্রায় সব পণ্ডিতই এই বিষয়ে একমত। বলতে গেলে আধুনিক অসমিয়া গদ্যে বেজবরুয়া নিয়ন্ত্রক এবং আদর্শ হয়ে আছেন এই একবিংশ শতকেও। যদিও বেণুধর শর্মার গদ্যে বুরঞ্জীর গদ্যের এবং উজান অসমের কথ্য শিষ্ট গদ্যের একটি বিশিষ্ট রূপ ব্যাপৃত হয়ে আছে তথাপি ব্যক্তিগত এরকম বিশিষ্টতা বিবর্তনের রূপ নয়। বরং বলতে পারি, এই গদ্য একপ্রকার কথকতার গদ্য। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক লেখকের রচনায় যে থাকে সে-কথার আভাস ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। বেণুধর শর্মার পরে এরকম বৈশিষ্ট্য লীলা গগৈ-এর গদ্যে নিজস্ব রূপের আকৃতি লাভ করেছে। অন্যদিকে তীর্থনাথ শর্মার হাতে অসমিয়া গদ্যের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তাঁর গদ্যে তৎসম, তদ্ভব শব্দের সঙ্গে মধ্যযুগের অসমিয়া পদ-পুঁথির শব্দ এবং গ্রামীণ অসমিয়া ভাষার শব্দ অনায়াসে কোথাও কোনো গুরুচণ্ডালী দোষ না-ঘটিয়ে ব্যবহার করে যাওয়ার নিজস্ব দক্ষতা লক্ষণীয়।

॥ এগারো ॥

যুগ-পরিবর্তনের ছাপ

আধুনিক অসমিয়া গদ্যের বিবর্তনের একটি রূপ পঞ্চাশের দশক থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন লেখকদের রচনার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায়। এরকম গদ্যে শব্দ ও প্রকাশভঙ্গির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষভাবে প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। হেম বরুয়া থেকে শুরু করে ইংরেজি সাহিত্যের অসমিয়া লেখকদের রচনায় সহজ ও স্বাভাবিকভাবে এরকম প্রকাশভঙ্গি লক্ষণীয়। এমন-কি তাঁর এই বিশেষত্ব বাংলায় লেখা 'লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া' শিরোনামের ছোট বইটিতেও ফুটে উঠেছে। ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকা অসমিয়া লেখকদের, বিশেষ করে গত শতকের শেষার্ধের কোনো কোনো লেখকের রচনায় এই লক্ষণটি দেখা যায়। অন্যদিকে, সৃষ্টিশীল রচনায় ভাববোধক বিষয়ের সঙ্গে সংগতি যুক্ত অর্থ বোঝানোর জন্য একটি মিশ্রভাষার ব্যবহার চোখে পড়ে। গল্পকার সৌরভকুমার চলিহার রচনায় এরকম শব্দ ও প্রকাশভঙ্গির প্রয়োগ তাঁর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে, হোমেন বরগোহাঞির রচনায় নিজস্ব শৈলীর শক্তিশালী অসমিয়া গদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মামণি রয়সম গোস্বামী বিষয়ের সঙ্গে সংগতি যুক্ত হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি প্রভৃতি শব্দও তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি গত শতকের ষাটের দশক থেকে ক্রমান্বয়ে অসমিয়া গদ্যকে এর পূর্বের গদ্য থেকে কিছু পরিমাণে পৃথক করে তুলেছে। পশ্চিমের সাহিত্যের বিভিন্ন নতুন ধারার প্রকাশভঙ্গির নিদর্শন অসমিয়া গদ্য এই সময় থেকেই সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। চেতন বা অবচেতনের বিষয় বোঝাতে ব্যবহৃত গদ্য একটি বিশিষ্ট গতিবেগ লাভ করেছে। ব্যাকরণ-নিয়ন্ত্রিত পথ থেকে কখনো-বা এরকম গদ্য নতুন রাস্তা বের করতে যত্নবান হয়েছে। ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি দেশী-বিদেশী কোনো কোনো শব্দ অপ্রয়োজনে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। কিন্তু চিন্তাশীল বা বিষয়জ্ঞাপক রচনায় পূর্বের মতোই নিয়ন্ত্রিত গদ্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে স্কুলে সংস্কৃত ভাষা ঐচ্ছিক ভাষায় পরিণত করার পর থেকে ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পথ বন্ধ হল। ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের অসমিয়া ভাষার মূল ভিত্তির সঙ্গে পরিচয় হল না। এমন-কি রাজনৈতিকভাবে সংস্কৃত ভাষা অ-আর্য মূলের ভাষাগোষ্ঠীর মূল ভাষা নয় এমন একটি ধারণারও জন্ম হল। কিন্তু আর্যভাষী বা অ-আর্যভাষী প্রভৃতি মূল থেকে আসা অসমিয়াভাষীদের ভাষার সঙ্গে যে সংস্কৃতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি চাপা পড়ে গেল। সংস্কৃত ভাষা তাই অব্যবহার্য হয়ে দাঁড়াল। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অসমিয়া ভাষার জ্ঞানও ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু হল। তদুপরি ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের শিক্ষাদান করার পরিবর্তে প্রায়োগিক ভাষাশিক্ষার পদ্ধতি প্রয়োগেও অসমিয়া ভাষার ব্যাকরণ শেখার আগ্রহ কমতে শুরু করল। যেসব ছেলেমেয়ে এভাবে স্কুল ও কলেজের শিক্ষা লাভ করে বেরিয়ে এল তাদের অসমিয়া ভাষা স্বাভাবিকভাবেই আবশ্যকীয় মান বহু সময়ে রক্ষা করতে পারল না। অন্যদিকে, উল্লেখযোগ্য যে বিশ শতকের আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে অসমে সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং নতুন নতুন 'টিভি চ্যানেল' স্থাপিত হয়েছে। এরকম সংবাদ পত্র-পত্রিকা এবং টিভিতে অনেক শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী নিযুক্ত হল। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচয়হীন এইরকম যারা নিযুক্ত হল তাদের কারো কারো হাতে অসমিয়া ভাষা ব্যাকরণের এবং ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আবশ্যক শুদ্ধরূপ হারাতে শুরু করল। তদুপরি ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে এরকম বিদ্যালয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে অসমিয়া ভাষার আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। এই কারণগুলি কথিত অসমিয়া ভাষার মান বহু পরিমাণে হ্রাস করেছে দেখা যায়। বাজার-দোকানে ব্যবহৃত অ-অসমিয়াভাষীর মুখের এবং হিন্দি সিনেমা বা সিরিয়ালের অনেক শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি অপ্রয়োজনীয় আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিকারকরূপে কথ্য ভাষায় এক শ্রেণির যুবক-যুবতীর মধ্যে চলতে আরম্ভ করেছে। অসমিয়া ভাষার নিজস্ব মৌলিক বৈশিষ্ট্যেরও এরকম শব্দ ও প্রকাশভঙ্গিতে ক্ষতি করার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। একবিংশ শতকের এরকম ঘটনা অসমিয়া ভাষার মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে না-পারলেও কথ্যরূপে যে-বিকৃতি লক্ষ করা যাচ্ছে তাতে ভাষাটির ভবিষ্যৎ ক্ষতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং এই অবস্থাকে ভাষার সুস্থ বিবর্তনের লক্ষণ হিসেবে মেনে নেওয়া কঠিন, বরং এর মধ্যে মান ও সৌন্দর্যের মৌলিকত্ব তথা বৈশিষ্ট্যের ক্ষতির সংকেত বেজে উঠেছে।

॥ বারো ॥

সমাপ্তি

অসমিয়া গদ্যের বিবর্তনের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে জড়িত হয়ে আছে ক্রমবিবর্তিত কয়েকটি যুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যাবহারিক ও বৌদ্ধিক জীবন। আর্য ও অ-আর্য লোকজীবন, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতির সমাহারই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলার উপাদান জোগান দিয়ে এসেছে। এর মধ্যে ভাষিক-সাংস্কৃতিকভাবে আর্য উপাদান নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে থাকলেও লোকবিশ্বাস সমন্বিত লোকসংস্কৃতি আর রক্তের দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু পরিমাণে সমৃদ্ধ। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ঘরদুয়ার যেভাবে এখানে স্বাভাবিকভাবে হওয়া ঘাস-বন, বাঁশ, বেত, কাঠ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত ঠিক তেমনই পঞ্চম শতক থেকেই পাথরের মন্দির প্রভৃতি নির্মাণের এবং সমগ্র উপত্যকা জুড়ে বিভিন্ন স্থানে সেরকম অজস্র মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির শক্তিশালী প্রভাবের পরিচয় বহন করে আসছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্মন বংশের সময় থেকে সংস্কৃত ভাষা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে ব্যবহার করার সাক্ষ্য অসমিয়া ভাষাকে নিজস্ব রূপ দিতে যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল তার প্রমাণ বহন করে এনেছে। একদিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কথ্যভাষারূপে এবং অন্যদিকে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত পালি-প্রাকৃতের প্রভাব পরবর্তী কাল পর্যন্ত সমান শক্তিশালী হয়েছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাব ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত চলেছে। ত্রয়োদশ শতকে আহোমদের আগমনে অসমিয়া কথ্যভাষার উপরে গুরুত্ব প্রদান এই ভাষার প্রচলন বৃদ্ধির জন্য অনেকটাই দায়ী। তাই অসমিয়া ভাষার কথিত গদ্যরূপের ক্রমান্বয়ে লিখিতরূপ পাওয়ার রাস্তা খুলে গেল। অসমিয়া ভাষায় বুরঞ্জী রচনা কথিত গদ্য-রীতিকে লিখিত মান্য রূপ জোগাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান জোগাল।

অঙ্কীয়া নাটের সংলাপের গদ্য, কথা-ভাগবত এবং কথা-গীতার গদ্য, বুরঞ্জীর গদ্য, ব্যাবহারিক বিষয়ের গদ্য এই সমস্তের মধ্য দিয়ে এসে অসমিয়া গদ্য ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এর শক্তিশালী গতি ও প্রকৃতি প্রতিষ্ঠা করল। এই কালসীমার মধ্যে দেখা গেল, দুই-একটি আরবি-ফারসি মূলের শব্দ, হিন্দি এবং বাংলা মূলের শব্দও জায়গা করে নিয়েছে। অবশ্য এই শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই প্রবেশ করেছে।

অসমিয়া গদ্যের আধুনিক যুগ যে ব্রিটিশ আসার পর মিশনারিদের হাতে আরম্ভ হয়েছে সে-কথাও ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। মিশনারি গদ্যে মিশনারিরা ইংরেজি বা বিদেশী শব্দকে ঘরোয়া অসমিয়া প্রতিশব্দে (যেমন বরফকে পানীশিল বলে, বেপটাইজ করাকে বুর পাওয়া বলে) অনুবাদ করেছিল। তথাপি এই ভাষার মধ্যে ইংরেজি ভাষার একটা ছাপ স্বাভাবিকভাবেই পড়েছিল। হেমচন্দ্র বরুয়া সেই ছাপ বিনষ্ট করে তাকে নতুন গ্রহণীয় রূপ দান করেন। যৌগিক বাক্য আর যতিচিহ্ন সহ ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেও আধুনিক অসমিয়া গদ্য একটি নির্দিষ্ট বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করল। যদিও নামনি অসমে কথিত গদ্যের একটি নিজস্ব ভঙ্গি ছিল, লিখিত মান্য গদ্যে সেরকম আদর্শের প্রভাব চোখে পড়ার মতো হয়ে উঠতে পারেনি।

আধুনিক অসমিয়া গদ্যের পরিবর্তন কিছু পরিমাণে সূচিত হল স্বাধীনতা লাভের পরের সময়কালে। এই সময় থেকে ইংরেজি ভাষা ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় নতুন শব্দ ও প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার রাস্তা করে দিল। তাহলেও অসমিয়া আধুনিক গদ্যের যে-ধ্রুপদী শৈলী প্রতিষ্ঠা করলেন হেমচন্দ্র বরুয়া, বেজবরুয়া, সত্যনাথ বরা প্রমুখ তাকে অবলম্বন করেই পরবর্তী সময়ের গদ্যরূপ পল্লবিত হয়েছে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক মন্থর হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নতুন লেখক, সাংবাদিকদের একাংশের মধ্যে ভাষা-ব্যবহারে সচেতনতা হ্রাস পেয়েছে। এমন-কি, অনেক সময় কোনো শব্দের উৎস ও প্রকৃত অর্থ না-বুঝে করা ব্যবহারও খাদ্যে মিশে-থাকা ছোট ছোট কাঁকরের টুকরোর মতো হয়েছে। অন্য একটি লক্ষণীয় দিক হল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে গড়ে-তোলা সভ্যতার বিশ্বায়নে অনেক নতুন শব্দ আর প্রকাশভঙ্গির সহজ আমদানি ঘটেছে। অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় স্থানেও কিংবা অপ্রয়োজনীয়ভাবেও এরকম শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি ভাষার সৌন্দর্য ভবিষ্যতে নষ্ট করতে পারে বলে শঙ্কা হয়। তাহলেও এখনও পর্যন্ত অসমিয়া ভাষার লিখিত মান্য গদ্যরূপ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেও নিজের বিশিষ্ট চরিত্র রক্ষা করে চলেছে। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিরও বিবর্তন ঘটবেই। প্রাচীন অনেক শব্দ, বাক্যাংশ, উপমা, উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, প্রকাশভঙ্গি অব্যবহৃত হয়ে পড়বে। নতুন কিছু এসে সেই স্থান অধিকার করবে। কিন্তু

পরিবর্তনের বাতাস যাতে গাছটিকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে না-পারে তার প্রতি ভাষা-ব্যবহারকারীদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অসমিয়া ভাষা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেও এখনও পর্যন্ত নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। অনেক নতুন শব্দ, প্রকাশভঙ্গি গ্রহণ করে নিজের করে নিয়েছে। "দিবে আর নিবে/মিলাবে মিলিবে" এই দৃষ্টিতেই অসমিয়া ভাষার গদ্য নিজেকে যুগোপযোগী করে তুলেছে এবং ভবিষ্যতেও করে যেতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। ❑

❑ অসমিয়া থেকে অনুবাদ : **মন্দিরা দাস**

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১) New Light on History of Asamiya Literature, Dimbeswar Neog, 1962.

২) Growth of the Asamiya Language Development of the Asamiya Script, Dimbeswar Neog, 1964

৩) অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী, ডিম্বেশ্বৰ নেওগ, ১৯৫৭।

৪) Assamese, Its Formation and Development, Banikanta Kakoti, 1941.

৫) অসমীয়া প্ৰচীন লিপি, সৰ্বেশ্বৰ কটকী, ১৯৩৩।

৬) Development of Script in Ancient Kamrupa, Dr. T.P. Verma, 1976.

৭) অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা, মহেশ্বৰ নেওগ, ১৯৬২।

৮) অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, ১৯৮১।

৯) The Evolution of Assamese Script, Mahendra Bora, 1981.

১০) History of Assamese Literature, Birinchikumar Barua, 1964.

১১) অসমীয়া কথা-সাহিত্য, বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুয়া, ১৯৫০।

১২) অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱ সমৃদ্ধি আৰু বিকাশ, উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, ১৯৯১।

১৩) অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষণাৱলী (প্ৰথম খণ্ড), সম্পা. অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা, ১৯৫৭।

১৪) অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষণাৱলী (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পা. অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা, ১৯৫৭।

১৫) অসম সাহিত্য সভাৰ ভাষণাৱলী (তৃতীয় খণ্ড), সম্পা. অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা, ১৯৬১।

১৬) ক্ৰমবিকাশত অসমীয়া কথাশৈলী, প্ৰফুল্ল কটকী, ১৯৭৯।

১৭) অংকাৱলী, সম্পা. কালিৰাম মেধি, ১৯৫০।

১৮) গুৰু চৰিত কথা, সম্পা. মহেশ্বৰ নেওগ, ১৯৮৭।

১৯) বৰদোৱা-গুৰু চৰিত, সম্পা. মহেশ্বৰ নেওগ, ১৯৭৭।

২০) ভাগবৎ-কথা, সম্পা. মহেশ্বৰ নেওগ, ১৯৫৯।

২১) কথা-গীতা, সম্পা. হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, ১৯১৪।

২২) অসম বুৰঞ্জী, সম্পা. সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা, ১৯৪৫।

২৩) তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী, সম্পা. সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা, ১৯৩২।

২৪) কামৰূপ বুৰঞ্জী, সম্পা. সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞা, ১৯৩০।

২৫) কামৰূপশাসনাৱলী, সম্পা. পদ্মনাথ ভট্টাচাৰ্য্য বিদ্যাবিনোদ, ১৯৩১ (বঙ্গাব্দ, ১৩৩৮)।

২৬) কামৰূপশাসনাৱলী (পৰিবৰ্ধিত সংস্কৰণ), সম্পা. ডিম্বেশ্বৰ শৰ্মা, ১৯৮১।

২৭) Inscriptions of Ancient Assam, Mukunda Madhava Sharma, 1978.

২৮) অৰুনোদই, সম্পা. মহেশ্বৰ নেওগ, ১৯৮৩।

২৯) বিৰিঞ্চিকুমাৰ বৰুয়া ৰচনাৱলী, সম্পা. নগেন শইকীয়া, ২০১৫।

৩০) লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, সম্পা. নগেন শইকীয়া, ২০১০।

৩১) Hastividyarnava, P.C. Choudhury, 1976.

৩২) ভাষণমালা (অসম ছাত্ৰ সন্মিলন), সম্পা. অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা, ১৯৬০।

৩৩) চৰ্যাপদ, সম্পা. পৰীক্ষিত হাজৰিকা, ১৯৭৩।

৩৪) চৰ্যাগীতিকোষ, সম্পা. বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকা, ২০১২।

৩৫) চৰ্যাগীত আৰু বৌদ্ধ-তন্ত্ৰ, সম্পা. প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা, ২০০১।

৩৬) প্ৰাচ্য-শাসনাৱলী, সম্পা. মহেশ্বৰ নেওগ, ১৯৭৪।